তিনটী চিত্র।

(উপন্যাস)

লা, মধুমতী ও মনোরমা।

লিকাতা—১১২ নং অপার চিৎপুর রোড,
শ্রীপ্রিয়নাথ পাল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta:

rinted by *H. D. Ghosh*, at the
GREAT TOWN PRESS,
163, Musjeedbari Street.

1894.

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য "তিনটী চিত্র" লেখা হয় নাই; কার্য্যের অবকাশে যে অল্প সময় পাইতাম, তাহারই মধ্যে তিনটী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এ বিদ্যায় অনভ্যস্ত, সুতরাং তাহার অঙ্কিত চিত্রে কোন জায়গায় রঙের আধিক্য হইয়াছে, কোন জায়গায় বা রঙ্ আদৌ ফলে নাই। গ্রন্থকার সেই জন্য কুণ্ঠিত; তবে ভাল মন্দ বিচারের ভার পাঠকবর্গের হস্তে।

গল্প তিনটী প্রথমে জন্মভূমি নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

জাহানাবাদ,
১লা বৈশাখ, ১৩০১

মুরলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল। দিনান্ত পরম রমণীয়। সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন। দু'একটী করিয়া তারা দেখা দিতেছে। বেল, মল্লিকা, রজনীগন্ধ ফুটিয়া উঠিতেছে। সুশীতল বায়ু সৌরভ বহন করিয়া অঙ্গ শীতল করিতেছে। নীড়াভিমুখীন পক্ষিকুলের কলরব সেই বায়ুর সঙ্গে স্তরে স্তরে নাচিতেছে। এমন সময় বিলাসপুরের জমিদারদের বাগানবাটীতে একটী ঝি একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা লইয়া বেড়াইতেছিল। পার্শ্বের বৈটকখানা হইতে এক প্রৌঢ়-ব্যক্তি অনিমিষনয়নে ঝির কোলে বালিকাটীর খেলা দেখিতেছিলেন। এই বালিকাটীই আমাদের মুরলা। তাহার খেলা দেখিতেছিলেন, তাহার পিতা হরিহর রায়।

হরিহর রায় বিলাসপুরের জমিদার। পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথমা পত্নী সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ করেন। পত্নীশোকে

বিহ্বল হইয়া, 'সদ্যোজাত শিশুর কি হইবে' কিছুই না ভাবিয়া হরিহর বিদেশে প্রস্থান করেন। এদিকে নবজাত শিশু ধাত্রির নিকট রহিয়া গেল। ক্রমে হরিহর বিদেশে সংবাদ পান যে চৌদ্দ দিনের দিনে এই শিশুও প্রাণত্যাগ করে। হরিহরের প্রাণ তখন উদাস হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং এ ঘটনায় তিনি আর অধিক চঞ্চল হন নাই। কালে শোকের গুরুভার প্রশমিত হইলে, আর দেওয়ানজীর পীড়াপীড়িতে হরিহর আবার গৃহে ফিরিয়া আসেন। কিছু দিন পরে, কতক স্ব ইচ্ছায়, কতক আত্মীয়, স্বজনের উপরোধে হরিহর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার প্রথমা ও শেষ কন্যা মুরলা ভূমিষ্ঠ হয়।

মুরলা, অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। একমাত্র কন্যা বলিয়া পিতামাতার বড় আদরের মেয়ে। অতুল ঐশ্বর্য্য ও পিতামাতার কোমল স্নেহের ছায়া, মুরলাকে, পৃথিবীতে যে কোন অভাব আছে, তাহা কখন জানিতে দেয় নাই। মুরলার কোন আবদার কখন ব্যর্থ হয় নাই।

কি বলিতেছিলাম?—মুরলা ঝির কোলে খেলা করিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ আবদার ধরিল,—"ঝি! আমি খোপায় গোলাপ ফুল দেব।" ঝি বলিল,—দাঁড়া মা! এই সন্ধ্যাবেলা কোথায় যাবি? আমি আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ঝি একটী ফুটন্ত গোলাপ আনিয়া দিল। ফুল মুরলার পছন্দ হইল না; নাকে কাঁদিয়া বলিল,—এ কিঁ ফুল! গন্ধ নাই! আঁর এঁকটা এনে দেঁ।" ঝি আর-একটা, আর-একটা, আর-একটা আনিয়া দিল; কোনটীই পছন্দ হইল না। ক্রমে

নাকে-কাঁদা বেশী মাত্রায় উঠিতে লাগিল। তখন বালিকা নিষেধ না মানিয়া নিজে গোলাপ তুলিতে গেল। বাছিয়া বাছিয়া, সুন্দর গোলাপ দেখিয়া, যেমন তাড়াতাড়ি ছিঁড়িতে যাইবে, অমনি হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝি তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইল, কিন্তু সে ক্রন্দনের বিরাম নাই। পিতা হরিহর রায় এতক্ষণ জানালায় দাঁড়াইয়া, বালিকার ফুল পছন্দ না হওয়ায়, মানুষের স্বাভাবিক অতৃপ্তির কথা ভাবিতেছিলেন। এমন কি, রাত্রে প্রিয়বন্ধু দেবেন্দ্র বাবু আসিলে, তাঁহাকে এই বিষয়ে এক কোর্য লেক্‌চার দিয়া প্রমাণ করিবেন ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে মুরলার উচ্চ ক্রন্দনে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি সেখানে দৌড়িলেন। ঝির কোল হইতে মুরলাকে টানিয়া লইয়া দেখিলেন, তখনও একটী কাঁটা আঙ্গুলে বিঁধিয়া রহিয়াছে। সযত্নে কাঁটাটী তুলিয়া লইলেন। ঝির দিকে রোষ-কষাইত চক্ষে একবার চাহিলেন। তাহাতে ঝি একেবারে শুকাইয়া গেল। তাহার মনে হইল, 'পৃথিবী দোফাঁক হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।' তেমন রাগ-মুখ আর বুঝি সে কখন দেখে নাই। তখন হরিহর বাবু মুরলাকে ক্রোড়ে করিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। বালিকা পিতার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই দিন অবধি রায়-সংসার হইতে গরিব ঝির অন্নজল উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জামাই-বাবু।

সময় কাহারও হাত-ধরা নয়। দেখিতে দেখিতে আবার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। এইমাত্র সেদিন আমারা যে মুরলাকে ছেলেখেলা করিতে দেখিয়াছিলাম, আজ সে আর বালিকা নাই। আজ তাহার বয়স প্রায় একাদশ বৎসর। বড়-মানুষের মেয়ে,—রাজভোগে আছে; কাজেই মুরলা যেন এই বয়সেই যৌবনের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিতেছে! কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স দেখিয়া, হরিহরও তাঁহার স্ত্রী উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে ব্যস্ত হইলেন।

ঘটকের আনা-গোনার ধুম পড়িয়া গেল একে অতুল রূপ-লাবণ্যসম্পন্না, তাহাতে আবার বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবি উত্তরাধিকারী সুতরাং রাশি রাশি পাত্র জুটিতে লাগিল। হরিহর ও তাঁহার পত্নীর কিন্তু কোনটীই পছন্দ হয় না। অবশেষে অনেক দেখা-শুনার পর, দুইটী পাত্র পছন্দ হইল। একটী ঘোষপুরের জমিদার অরবিন্দ ঘোষের পুত্র, নাম - চারুচন্দ্র ঘোষ; আর

একটী বিলাসপুরেরই মধ্যবিধ অবস্থার গৃহস্থ নীলমণি ঘোষের পুত্র, নাম—মন্মথনাথ ঘোষ। দুইটীই সমবয়স্ক ও এক ক্লাসে অধ্যয়ন করিত। এখন দুইটী পাত্রই মনোনীত হইলেও, যদিও হরিহরের চারুর সঙ্গে বিবাহ অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, তথাপি তাঁহার গৃহিণীর তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার মত হইল না। চারু জমিদারের ছেলে। তাহার পিতা চারুকে ঘরজামাই রাখিতে অসম্মত হইলেন। এদিকে হরিহরের পত্নী, মুরলাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে নারাজ। সুতরাং অবশেষে মন্মথের সঙ্গে মুরলার বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। পুত্রকে ঘরজামাই রাখিতে নীলমণির অমত ছিল না। অত বিষয়ের লোভ কে ছাড়িতে পারে? যাহা হউক, মহা সমারোহে মন্মথের সহিত মুরলার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর মন্মথ ঘরজামাই হইলেন। কিন্তু সেই অবধি তাহার সঙ্গে চারুর কি-যেন একটা শত্রুতা জন্মিয়া গেল। স্কুলে মন্মথের নাম "জামাই-বাবু" হইল। চারু যখন মন্মথকে "জামাই-বাবু" বলিয়া ডাকিত, তখন তাহার স্বরের সঙ্গে এমন একটী বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গভাব মিশ্রিত থাকিত যে, মন্মথ তাহা আর সহ্য করিতে পারিত না। ক্রমে উভয়ের বাক্যালাপ বন্ধ হইল। কিন্তু হইলে কি হয়, আর আর বালকেরা যে, ক্রমে চারুর দিক্ ধরিল! সংসারে হঠাৎ-বাবুকে কেহই দেখিতে পারে না। আমাদের মন্মথের সেই দশা হইল। ক্রমে স্কুলের ঘণ্টা বাজিলেই, "জামাই-বাবু" ছেলেদের একটা খেলাইবার জিনিস হইয়া দাঁড়াইল। কথাটা ক্রমে হরিহরের কাণে গেল। তিনি বলিলেন, মন্মথ যাহা শিখিয়াছে, তাহাতেই ঢের হইবে। তাহাকে আর খাটিয়া খাইতে হইবে না, তাহার

আর লেখা-পড়ায় কাজ নাই। মন্মথের লেখাপড়া এইখানেই সাঙ্গ হইল। তার সাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু স্কুলের উপর হরিহর জাতক্রোধ হইলেন। তিনি অনেক টাকা চাঁদা দিতেন; চাঁদা বন্ধ করিলেন। আর আপনার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যাহাকে পাইলেন, তাহাকে ধরিয়া, চাঁদা বন্ধ করাইলেন। স্কুলের খরচে অকুলান হইল। দিন কতক ঘোষপুরের ঘোষেরা, বেশী চাঁদা দিয়াছিলেন; কিন্তু বেশী দিন দিতে পারিলেন না। মন্মথের লেখা-পড়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলও উঠিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপমান।

"তা অত বাড় ভাল নয়, দর্পহারী মধুসূদন আছেন"—এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে বাবুদের পুকুর-ঘাটে, বামা-চাকরাণী বাসন মাজিতেছিল বামার মুখখানা ভার,ভার; কিন্তু হস্তের নিষ্পেষণ এত অধিক যে, নির্জ্জীব বাসন এক একবার যেন ঘুরিয়া যাইতেছিল। এমন সময় রাঁধুনি-ঠাকরুণ-দিদি, পুকুর-ঘাটে গা ধুইতে আসিল। বামা তাহাকে দেখিয়া, তাহার কথার মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিল। ঠাকরুণ-দিদি অমনি বামার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বামাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি, বামা! আবার কি হ'ল?" বামা নিরুত্তরে বাসন মাজিতে লাগিল; মুখখান কিন্তু বেশী ভার-ভার হইল। ঠাকরুণ-দিদির আবার জিজ্ঞাসা—"বলি, বামা! কথাটা কি?" বামা আরও কিছু বেশী জোরে বাসন মাজিতে মাজিতে বলিল,—"আমি ত আগেই জানি, বড়-মানুষের বাড়ী চাকরি করিতে হইলে, এইরূপই হইবে! আমরা গরিব, আমাদের মান নয়।" ঠাকরুণ-দিদির আর তর

সহে না,—পারে ত আসল কথাটা সাঁড়াশী দিয়া বামার পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লয়। কিন্তু প্রকাশ্যে একটু সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল,—"বলি, বোন! তুমিও যে মনিবের চাকর, আমিও তাহার। আমাকে কি পেটের কথা খুলিয়া বলিতে নাই?" বামা কিন্তু এখনও ভাঙ্গে না। এইবার আরও জোরে বাসন মাজিতে মাজিতে বলিল,—"আর কি! ছেলেবেলা বিধবা হইয়াছি; স্বামীরও বিষয় নাই, বাপেরও ভাত নাই; তাই পরের খাড়ী উঠান্ ঝাঁট দিয়া খাই;—এখনই এই! এর পর না-জানি কপালে কি আছে?" এই বলিয়া বামা এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। ঠাকুরুণ-দিদির এমনি ইচ্ছা হইল যে, বামার চোখ দুটা উপাড়িয়া আনে। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, "বোন্! তা, যা যার অদৃষ্ট। এর উপর যারা দাগা দেয়, তাদের উপর ভগবান্ মধুসূদন আছেন।"

এবার বামা দেখিল যে, আর চাপিয়া রাখা ভাল নয়। ঠাকুরুণদিদি ভগবানের দোহাই দিয়া চলিয়া যায়। তখন বামা আভাস দিল,—"আর বোন্! আমরা ত ছোট লোক, আমাদের সব সয়; কিন্তু অমন স্বামী!—আহা! স্বামী নয়ত যেন কার্ত্তিক! তার গায়ে হাত তোলা।" এই টুকু শুনিয়াই ঠাকুরুণদিদি হাঁপাইয়া উঠিল; তাহার পেটের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি আধকাচা কাপড় লইয়া, "যাই বোন্! রাঁধবার বেলা হয়েছে" বলিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরুণদিদি যে কি করিবে, বামা বেশ জানিত। আরও জানিত যে, ঠাকুরুণদিদির কল্পনাশক্তি একটু বেশী।

তাই এতক্ষণ তাহাকে আসল কথা খুলিয়া বলে নাই। যাহা হউক, ঠাকুরুণদিদি যাইবার সময় ক্ষান্ত গোয়ালিনীর বাড়ী হইয়া গেল এবং "ক্ষেন্তি! তোর খোকা কেমন আছে বলিয়া তাহার বাড়ী ঢুকিল ও তাহার কাণে কাণে বলিল,—"আর শুনেছিস্, আমাদের মুরলা নাকি জামাই বাবুকে নাতি মেরেছে! ক্ষান্ত বুঝি তাড়াতাড়িতে কথাটা ভাল শুনিতে পাইল না; কিন্তু সে পাঁচির মাকে 'নাতি'র জায়গায় 'ঝাঁটা মারিয়াছে' বলিয়া ফেলিল। ক্রমে কথাটা বাড়িয়া গিয়া দাঁড়াইল যে, মুরলা মন্মথকে লাথি ও ঝাঁটা মারিয়া বাটির বাহির করিয়া দিয়াছে। কথাটা দেওয়ানজীর কাণে পৌঁছিল। তিনি তাড়াতাড়ি হরিহর বাবুর বাড়ীতে ছুটিলেন;—মন্মথ কোথায়? মন্মথকে দেখিলেন বটে, কিন্তু কি যে একটা ঘটিয়াছে, তাই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে নানা রকম অঙ্গ-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইয়া কথাটা হরিহর বাবুর কাণে পৌঁছিল। তখন হরিহর বাবু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। গভীর গবেষণা করিয়া তিনি কি সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা রায়বংশের ইতিহাসে লেখে না। সুতরাং এ বিষয়ের যথার্থ তথ্য সম্বন্ধে নরলোক চিরকাল অনভিজ্ঞ থাকিবে। তবে দেওয়ানজী নাকি কানা-ঘুষায় অনেক কথা শুনিতে পান, আর তাঁহার নিকট হইতে আমি যেমন শুনিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য বলিতে হইল।

ব্যাপারটা এই,—কালীপূজা উপলক্ষে, নীলমণি ঘোষের বাড়ী হইতে হরিহর রায়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়। নীলমণি নিমন্ত্রণের সময় বিশেষ করিয়া উপরোধ করিয়া যান যে,

মন্মথ বৌমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। এখন নিমন্ত্রণ পাইবার পরদিন মন্মথ মুরলাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। বামা-দাসী নিকটে ছিল। সে মধ্যে যোগ দিয়া বলিল,—"তা যাবে বৈকি মা। শ্বশুরবাড়ী জন্ম জন্ম যেতে হয়। তোমারই ভাগ্যে যেন শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটে নাই, তা ব'লে কি পাল-পার্ব্বণে যাবে না!" ইদানীং মুরলা বাপের বাড়ীর অতিরিক্ত আদরে, সোহাগে কিছু উদ্ধত-স্বভাব হইয়াছিল। কেহ "হাঁ" বলিলে, তাহাকে "না" বলাইতে তাহার বড় আমোদ হইত। একে ত সে "যাইব না, যাইব না" করিতেছিল; তাহার উপর বামার কথা আর তাহার গায়ে সহিল না। মুরলা বলিয়া উঠিল,—"আমি যাই, না যাই, তোর খপরে কাজ কি লো বাঁদী! হারামজাদী! তুই যেমন, তেমনি থাক্। ফের আমার কথায় কথা কবি ত ঝাঁটা খাবি।" কথাটা বামার গায়ে বিন্ধিয়াছিল। বিশেষ কারণ, সে চাকরী করিয়া ও সুদ খাটাইয়া কিছু টাকা জমাইয়াছিল; এখন বড় একটা চাকরী গ্রাহ্য করিত না। মুরলার কথা শুনিয়া বামা বলিল "তা বল্‌বে বৈকি মা!" এখন বল্‌বে বৈকি। যখন একটুকু ছিলে, তখন যে বামা ছাড়া চলিতে না। এখন যে বড় হইয়াছ!" মুরলা সপ্তমে উঠিলেন, বামাকে আরও কতকগুলা গালি দিলেন। বামাও দু-একটা মিষ্ট জবাব দিল। শেষে মুরলা বলিল, "রোস্‌ত মাগী! বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। দেখ্‌বি ঝাঁটা পেটা করব।" এই বলিয়া মুরলা ঝাঁটা লইয়া যেমন বামাকে মারিতে যাইবে, অমনি মন্মথ মাঝে পড়িলেন। সেই উদ্ধত

ঝাঁটা অমনি হাতেই রহিয়া গেল। বামা কিন্তু গোপনে দেওয়ানজীর কাণে কাণে নাকি বলিয়াছিল যে, সেই ঝাঁটা জামাই বাবুর গায়ে পড়ে। যাহাহউক, মুরলা বড়ই লজ্জা পাইল। মন্মথ তখন সেখান হইতে সরিয়া গেল।

অনুসন্ধানের পর হরিহর কন্যাকে জামাতার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর, মুরলার এমন লজ্জা উপস্থিত হইল যে, সে কোনমতে যাইতে স্বীকার করিল না। অবশেষে মুরলা অনেক পীড়াপীড়িতে বলিল যে, আমাকে জোর করিয়া পাঠাইলে আমি গলায় দড়ি দিব। অগত্যা মুরলার যাওয়া হইল না। মন্মথ একাই বাপের বাড়ী যাইলেন। যাইবার সময় কোথা হইতে চারুর সঙ্গে পথে দেখা হইল। চারু আর একজনের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মন্মথকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আরে ভাই! ঘরজামাইয়ের কথা কও কেন! পরিবার ঝাঁটা দিলে বাপের বাড়ী ধুকড়ী মন্ত্র লইতে যাইতে হয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ।

যথাসময়ে যথানিয়মে নীলমণি ঘোষের বাড়ী কালীপূজা হইয়া গেল। অনেক দূর দূরান্তের আত্মীয়-কুটুম্বেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া মন্মথের বৌ দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু বৌ কোথা? তাঁহাদের কথায় ঘোষ-গৃহিণীর মনটা একটু ভার হইয়া উঠিল। তিনি মন্মথকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! লোকে নিজের ছেলে দিয়ে পরের মেয়ে ঘরে আনে। আমি এমন হতভাগিনী, নিজের ছেলে দিলাম বটে; কিন্তু নিজের ছেলেও পাইলাম না, পরের মেয়েও পাইলাম না।" এরি মধ্যে ঠাট্টা করিবার সম্পর্কীয় একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "ওরে মন্মথ এত ভেড়া হইয়া গেলি যে, বাপ-মার অনুরোধেও একটা দিনের জন্যে সে কচি বৌটাকে আনিতে পারিলি না।" কথাগুলি মন্মথের বুকে বড় বাজিল।

বাস্তবিক মন্মথের মনে বড় ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যদি কখন টাকা উপায়

করিয়া, হরিহর রায়ের উপযুক্ত জামাতা হইতে পারেন, তবেই আবার মুরলার সঙ্গে দেখা করিবেন, নহিলে তাহার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি মনে করিলেন, আর হরিহর রায়ের বাড়ী যাইবেন না। কিন্তু এই সময় তাঁহার মনে একটা বিষম গোলমাল উঠিল। তিনি ত হরিহরের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। হয় ত জন্মের মত ফিরিবেন না। তা যাইবার আগে কি একবার মুরলাকে দেখিয়া যাইবেন না? মন্মথ আজন্ম রূপের উপাসক। বিশেষ যৌবনে রূপজ মোহ মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে। তা মন্মথ, কি যাইবার আগে, সেই রূপের অনন্ত-লহরী-লীলার স্থান—মুরলাকে একবার দেখিবে না? সেই রাঙ্গা টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি, সেই গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডস্থল, সেই পটোল চেরা চোখ দুটী, সেই ভাসা-ভাসা বিলোল কটাক্ষ, সেই কুসুম-সুকুমার দেহ, সেই প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না রূপের সমষ্টি, কি মন্মথ একবার জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া বুকে করিবে না? তখন মন বলিল,—"আর অত করিয়া কাজ নাই,—ফিরিতে পারিবে না।" ইন্দ্রিয় বলিল,—"সে কি? একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিতে দোষ কি?" মন বলিল,—দেখিলেই মোহ; মোহেই লোভ; লোভেই বুদ্ধিনাশ; দেখিয়া কাজ নাই। ইন্দ্রিয় বলিল,—"বুদ্ধিনাশ ত অনেক দিন হইয়াছে, নহিলে ঘর-জামাই হইতে যাবে কেন? আর একবার চল, দেখিয়া যাই।" তখন মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ে বিষম যুদ্ধ বাধিল। মন ইন্দ্রিয়কে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই মন্মথ আবার মুরলার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল।

হায় রূপ! ঈশ্বরের সুন্দর হস্ত তোমাতে দেখিতে পাই বলিয়া কি তোমার জন্য এত লালসা? না, তোমার সঙ্গে অদম্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের কোন সম্পর্ক আছে? ইহার সদুত্তর কে দিবে? কিন্তু তুমি যে, অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরে অনেককে মজাইয়াছ, তার কি কথা আছে? এদিকে সুবাসিত-দীপে বিভাসিত যে গৃহে মুরলা শয়ানা, সেইখানে মন্মথ উপস্থিত হইলেন। আ মরি মরি! এই নিদ্রিত অবস্থার কি রূপ! কে বর্ণনা করিবে? ভ্রমরকৃষ্ণ অলকদাম বায়ুভরে কপোলে পড়িয়া কি সুন্দর খেলা করিতেছে। চিন্তারেখাশূন্য কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম কি রমণীয় জিনিষ! আলুথালু বসন, দেহযষ্টির সৌকুমার্য্য দ্বিগুণিত করিয়া তুলিয়াছে। মন্মথ, সংসারের ললামভূতা এই সুরসুন্দরীকে কোন্ প্রাণে ছাড়িয়া যাইবে? মন্মথ কতক্ষণ অনিমিষনয়নে সেই নিদ্রিত রূপ-মাধুরী দেখিলেন। আবার সেই মোহ;—আবার সেই সঙ্কল্পত্যাগের ইচ্ছা। হরি, হরি! মনের দৃঢ়তা যে ভাসিয়া যায়। তখন অনেক কষ্টে সাহসে বুক বাঁধিয়া মন্মথ ডাকিলেন, "মুরলা।" নিদ্রিতা সুন্দরী নিরুত্তর। আবার অপেক্ষাকৃত উচ্চে ডাকিলেন, "মুরলা!" মুরলা চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু নিরুত্তর।

তখন মন্মথ মুরলার হাত দুখানি ধরিয়া গদগদ স্বরে আবার ডাকিলেন,—"মুরলা!" মুরলা উত্তর করিলেন, "কেন বিরক্ত করিতেছ? আমার ঘুম পাইতেছে। তুমি কি আমাকে ঘুমাইতে দিবে না?" কিন্তু মন্মথ সে কথা শুনিল না,—মনের আবেগে বলিয়া যাইতে লাগিল, "মুরলা! মুরলা! আজ ও

বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কয়দিনের জন্য আমি সুখী হইয়াছি? যদি ভাল খাইলে, ভাল পরিলেই মানুষ সুখী হয়, তবে আমি সুখী। কিন্তু সে সুখ আমি চাহি না। স্বোপার্জ্জিত তণ্ডুলকণা, পরোপার্জ্জিত পায়সান্নের অপেক্ষা খাইতে মধুর' এ কথা আমি আগে জানিতাম না; কিন্তু ঠেকিয়া শিখিয়াছি। আর এক কথা,—গরবিণি! যখন আমার প্রতি "হাঁ" কে তুমি "না" করিয়াছ, তখন প্রতিবারে আমার এক একটী মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। তবুও ঐ মুখের দিকে চাহিয়া সব ভুলিয়াছিলাম; কিন্তু আজ আমার সহিষ্ণুতা চরমসীমা অতিক্রম করিয়াছে। তুমি কালীপূজায় আমাদের বাড়ী যাইলে না; তুমি যেমন ভাল বুঝিলে, তেমনি করিলে; কিন্তু মুরলা মায়ের ও বন্ধুবর্গের তিরস্কার-বাণী আমার মনে ধিক্কার উপস্থিত করিয়াছে। তাই মুরলা! আজ তোমাদের বাড়ী ছাড়িয়া, তোমাকে ছাড়িয়া যাইব। যদি কখন তোমার বাপের উপযুক্ত জামাতা হইতে পারি, যদি কখন জোর করিয়া তোমাকে আমার বাড়ী লইয়া যাইতে পারি, তবেই আবার তোমায় আমায় দেখা হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত। মুরলা! আজ বুঝি আমাদের এই দেখা জন্মের মত শেষ দেখা।

উচ্ছসিত হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু তপ্ত অশ্রুকণা মুরলার হাতে পড়িল। মুরলা বলিল,—"এ কি! তুমি কাঁদিতেছ নাকি? তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও কাঁদিয়া কি লাভ? আবার যদি কাঁদ মাকে বলিয়া দিব।"

মুরলা ভাবিতেছিল, প্রকৃত শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার হুজুক কাটিয়া গেল; আবার বুঝি কিছু নূতন কথা আছে। তাই মন্মথ, ভয় দেখাইতেছে। আর চলিয়া যাওয়া কার সাধ্য? এত বিষয়ের লোভ কি মন্মথ ছাড়িতে পারে?

মুরলা ইচ্ছার সহিত অবশ্যই মন্মথকে তাড়ায় নাই। মুরলা যে মন্মথকে ভালবাসিত না তাহা নহে তবে তাহার দম্ভ অহঙ্কার আর ষোলআনা কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা বলবতী ছিল বলিয়া সে তাহার ভালবাসা বুঝিতে পারিত না আর মন্মথ যদি "ঘরজামায়ে" না হইতেন, তাহা হইলে, বুঝি মুরলার এ কর্ত্তৃত্বে মন্মথের তাদৃশ কষ্টবোধ হইত না।

কিন্তু মুরলে! আজ তুমি তাল ঠিক রাখিতে পার নাই। কি কথায় কি উত্তর দিলে! স্বামীর উত্তপ্ত অশ্রুকণায় তুমি কটূক্তি করিলে, উপহাস করিলে, অবজ্ঞা করিলে! তুমি অবোধ;—তুমি বুঝিতে পার নাই! মুরলে! তোমার সৌভাগ্য চন্দ্র আজ অস্তমিত! তোমার সুখ-সরোবর আজ শুষ্কপ্রায় তোমার সোণার সংসার শ্মশানতুল্য! মুরলে! তুমি বুঝিতে পার নাই, আজ যে অশ্রুকণা মন্মথের হৃদয় কাটিয়া চক্ষু কাটিয়া তোমার হস্তে পতিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বেদের অশ্রুকণা!—তোমার পিতার বিপুল বিষয়বৈভব, সে নির্ব্বেদকে অন্তর করিতে পারে না।

মন্মথ আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইলেন। পরদিন প্রভাতে—মন্মথকে আর কেহ দেখিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

খপরাখপর।

রায়েদের বাড়ীর রন্ধনশালায় বামা চাকরাণী মসলা বাটিতেছিল; আর ঠাকরুণদিদি এলোচুল করিয়া পা মেলিয়া উনুনে জাল দিতেছিল। বামা বলিল, "আর, শুনেছ ঠাকরুণদিদি! জামাই বাবু নাকি নিরুদ্দেশ।" ঠাকরুণদিদি একটু "গেরে-ভারি' লোক; বামার কথা উড়াইয়া দিয়া বলিল, "হাঁ গো হাঁ, ঢের লোক এমন নিরুদ্দেশ হয়! এত বিষয়! এমন চাঁদ-পানা বৌ,—অনেক লোক ছেড়েচে দেখেছি! কোথায় একটু ঘর করিতে ঝগড়া হইয়াছে,—বাপের বাড়ী গিয়া বসিয়া আছে। এখনি আসিবে!" বামা বলিল, "না গো না,—বাপের বাড়ী যায় নাই, এই মাত্র পাঁড়ে ঠাকুর নীলমণি ঘোষের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। সে বলে, তাহারা মন্মথের বাপ্প ও জানে না।" ঠাকরুণদিদি বলিল, "চুপকর তুই; রাগ পড়িয়া গেলে, একটু বাদে এখনি আসিবে। আমাদের কর্ত্তার যেমন রকম, একটুতে আঁকু-পাঁকু করিয়া মরেন।"

কথাটা কেমন যামার যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল। বাস্তবিক রায়েদের বাড়ীর সকলেরই মনে হইয়াছিল, রাগ পড়িয়া গেলে, অনতিবিলম্বে মন্মথ ফিরিবে। কিন্তু তবুও মন্মথের জন্য লোক ছুটাছুটি করিতে ক্রুটি করে নাই। ক্রমে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মন্মথ ফিরিল না। তখন হরিহর রায়ের মনে একটু ভয় হইল। মুরলাকে কত লোকে কত বলিতে লাগিল সে আর সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহে না। মুরলাকে কেবল তিরস্কার করিল না, তাহার মাতা। তিনি বুঝিলেন যে, ঘরজামাই এর আবদার না করিলে, বুঝি এতটা ঘটিত না। যাহাই হইক, লোক ছুটাছুটি ব্যর্থ হইল। মন্মথ ফিরিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নানাকথা।

ক্রমে এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে নীলমণি ঘোষের সঙ্গে হরিহর রায়ের কিছু মনান্তর ঘটিয়া গেল। নীলমণি বড় বিষয়ের লোভে ছেলেকে ঘর-জামাই করিতে দিয়াছিলেন। এখন মূলে হাবাৎ, ছেলে শুদ্ধ নিরুদ্দেশ। "সেই রাক্ষসী বৌ-ই এমন করিল; আর তার মুখ দেখিব না; তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিব না" নীলমণি ইহা স্থির করিলেন।

হরিহর রায়, মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে নীলমণিকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। নীলমণি বলিয়া পাঠাইলেন, "যে বিষয় ভোগ করিবার, সে যখন নাই, তখন আমি ও-বিষয় বিষ্ঠা মনে করি।" সেই অবধি বেহাইয়ে বেহাইয়ে মনান্তর হইল।

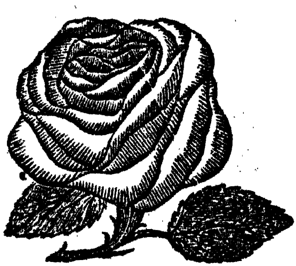
কিছুদিন পরে হরিহরের সঙ্কট পীড়া হইল। একে বৃদ্ধ বয়স; তাহাতে একমাত্র কন্যা, স্বামী বর্ত্তমানে চিরদুঃখিনী। এটী বৃদ্ধের বুকে বড় বাজিয়াছিল। অতুল সম্পত্তি, কিন্তু কে ভোগ করে? ইদানীং বৃদ্ধ, যখনই মুরলার মুখ পানে চাহিতেন, তখনই অলক্ষ্যে একবিন্দু অশ্রু কপোল বহিয়া পড়িত কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আঃ! বৃদ্ধ বয়সে এতও চোখে জল হয়!" মুরলা অনেক বার ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু নিজের অদৃষ্ট ভিন্ন আর কাহাকেও তাহার দোষ দিবার ছিল না। শেষে ভাবিয়া ভাবিয়া বৃদ্ধের ব্যারাম হইল; ডাক্তার কবিরাজ আসিল, অনেক ঔষধ-পত্র প্রয়োগ করিল; কিছুতেই কিছু হইল না, শেষে গঙ্গাজল হরিনাম ব্যবস্থা করিল। সময় বুঝিয়া বৃদ্ধ উইল করিলেন। সমস্ত বিষয় জামাতা, তাহার অবর্ত্তমানে কন্যা ও তাহার অবর্ত্তমানে কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবার কথা উইলে রহিল। পরে হরিনাম করিতে করিতে তুলসী-তলায় হরিহরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার ভার্য্যাও স্বর্গারোহণ করিলেন; সুতরাং সমস্ত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার মুরলার উপর পড়িল। মুরলা একবার শ্বশুরকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিলেন না। সুতরাং এক দেওয়ানজীকে লইয়া মুরলাকে সব দেখিতে শুনিতে হইল। এখন মুরলা সংসারে একা, হাল-হীন তরী, একাকী প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। হায় মন্মথ! এই সময় যদি তুমি একবার আসিতে? মুরলা মনে করিত, সে স্বামীর নিকট অপরাধিনী; এই মনে করিয়া আপনা-আপনি কুণ্ঠিত

হইত। আবার মনে করিত, তিনি কি নিষ্ঠুর! এত হইয়া গেল, তবু কি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না? আর প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্তে পাপ খণ্ডন হয়; কর্ম্মসূত্র খণ্ডন করে কাহার সাধ্য?

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল, মন্মথের কোন সন্ধান হইল না। দেওয়ানজীর উপর আদেশ ছিল, যে সব লোক চারিদিকে সন্ধানে গিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে কোন খবর পাইলে মুরলাকে যেন জানান হয়। কত খবর আসিল, দেওয়ানজী প্রায়ই খবর লইয়া যাইতেন। খবরটা প্রায়ই এইরূপ হইত আজ কাশী হইতে লোক ফিরিয়াছে। যাহাকে মন্মথ বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল, সে আমাদের মন্মথ নয়। নাম মন্মথ বটে; কিন্তু জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। এই হুজুকে অনেকের বিনা পয়সায় তীর্থ-দর্শন হইয়া গেল।

এদিকে মুরলা কঠিন বার-ব্রত আরম্ভ করিলেন। সেই সুকুমার দেহ দুশ্চিন্তায় ও কঠিন উপবাসে শীর্ণ হইতে লাগিল একমাস পরে একদিন দেওয়ানজী হঠাৎ কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীর ভিতর গিয়া মুরলার মুখপানে তাকাইয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মা! একি?" মুরলা বুঝিতে পারিলেন বলিলেন, "দেওয়ানজী! বুঝি শীঘ্র সকল দুঃখের অবসান হয়। দেওয়ানজী! আমায় তীর্থ-দর্শন করাও।" বৃদ্ধ প্রভু-ভক্ত দেওয়ানের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। "হা, ঈশ্বর! আমাদের এই দেখাইতে রাখিয়াছিলে" বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,

"মা! তোমার এখানে আর থাকা হইবে না। এখানে থাকিলে তোমার চিকিৎসা হইবে না। চল, তোমায় শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাই।" দেওয়ানজীর পীড়াপীড়িতে মুরলা অগত্যা শ্বশুরবাড়ী যাইতে সম্মত হইলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরবাড়ী।

দেওয়ানজী স্বয়ং পাল্কী সঙ্গে নীলমণি ঘোষের বাড়ী হাজির হইলেন। মুরলার নাম শুনিয়াই নীলমণি ঘোষ "রাক্ষসী বৌ-এর আমার বাড়ীতে স্থান হইবে না" বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু দেওয়ানজী একেবারে দিশাহারা হইলেন না. পাল্কী শুদ্ধ অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। পাল্কী পৌছিবামাত্র ঘোষের গৃহিনী "কে আসিয়াছে" দেখিতে আসিলেন। অমনি মুরলা 'মা' বলিয়া পাল্কী হইতে নামিয়া শাশুড়ীর পদতলে পড়িলেন নামিবার সময় তাড়াতাড়িতে পাল্কির ধার লাগিয়া মুরলার কপাল কাটিয়া গেল যন্ত্রণায় মুরলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; তাঁহার মস্তক তাঁহার শাশুড়ির পদতলে রহিয়া গেল। সেই মুরলা—সেই রূপ-যৌবন-ধনগর্ব্বে আত্মহারা, অট্টালিকা-বাসিনী মুরলা,—আজ তাহার মস্তক কুটীরবাসী ঘোষপত্নীর পদতলে বিলুণ্ঠিত! ঘোষগৃহিনী পুত্রশোকে হাজার বিহ্বলা হইলেও রমণী, মুর-

লার এদশা দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন 'আয় মা! চির-দুঃখিনী" বলিয়া মুরলাকে কোলেতুলিয়া লইলেন, সযত্নে ব্যজন করিতে করিতে সেই আধিক্লিষ্ট মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, সেই মুখ কালিমাময় হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সব সৌন্দর্য্য যায় নাই। গৃহিণী মনে মনে ভাবিলেন, এমন চাঁদপানা বৌ লইয়া সোণার সংসার পাতিতে পারিলাম না। কতক্ষণ পরে সংজ্ঞা হইলে গৃহিণী মুরলাকে 'মা' বলিয়া ডাকিলেন। অনেক দিন কেহ অত আদর করিয়া মুরলাকে 'মা' বলিয়া ডাকে নাই। সেই আদরের ডাকে মুরলার হৃদয় গলিয়া গেল, মুরলা কতই কাঁদিল। গৃহিণী অনেক সান্ত্বনা করিলেন; বলিলেন, "মা! ভয় কি, আজ হইতে আমার বাড়ী থাক; যদি কখন ভগবান দিন দেন, আবার মন্মথ ফিরিয়া আসে, তোমায় রাজরাণী করিব।" শ্বশুরগৃহে মুরলার চিকিৎসা হইতে লাগিল।

বিপদ কখন একা আসে না; অবসর বুঝিয়া চারু এক মোকদ্দমা বাধাইয়াছিল। কোথা হইতে একটা ছেলেকে হাজির করিয়া "হরিহরের প্রথমা পত্নীর ছেলে" বলিয়া খাড়া করিল। চারু প্রমাণ যোগাড় করিল যে, হরিহরের প্রথমা পত্নীর পুত্র যে ১৪ দিনের দিনে মরিয়াছে বলিয়া লোকে জানে, সেটা অমূলক। সে বাস্তব মরে নাই, নরেন্দ্রনাথ নামে এ পর্য্যন্ত অনন্ত মণ্ডলের বাড়ী পালিত হইয়াছিল; অনন্ত মণ্ডলের স্ত্রী নিঃসন্তান, সে ধাত্রীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া হরিহরের প্রথমা স্ত্রীর সন্তানটী কিনিয়া লইয়াছিল। আকৃতি সৌসাদৃশ্য সম্বন্ধে বামপদের ছয়টী আঙ্গুল দেখাইয়া দিল। গ্রামে হুল-

স্কুল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল—"হবেও বা, নহিলে অনন্ত মণ্ডলের ঘরে অত সুন্দর ছেলে কোথা হইতে আসিবে?" কেহ বলিল "তাও কি হয়! এতটা কাণ্ড হইয়া গেল আর কেহ টের পাইল না?" কেহ বলিল, "ধাই-মাগী যত নষ্টের গোড়া, তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই সব টের পাওয়া যাইবে।" কিন্তু এই গোলযোগের সূত্র পাইতেই ধাই-মাগী পলাইয়াছিল; অনেক কষ্টেও তাহার সন্ধান হইল না।

এদিকে খুব মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। যে চাকরাণীর অনবধানতা বশতঃ মুরলার হাতে গোলাপের কাঁটা ফোটে, সে মাগী হলফ করিয়া বলিল যে, নরেন্দ্রনাথই হরিহরের ছেলে; তবে সে খালি অনন্ত মণ্ডলের স্ত্রীর কথায় এ এপর্য্যন্ত এ কথা ভাঙ্গে নাই। অনকতক স্কুল মাষ্টার, যাহাদের চাকরি, হরিহর স্কুল উঠাইয়া দিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারাও হলকান এজেহার দিল যে, হরিহরের ধাত্রীকে তাহারা একটী শিশুকে অনন্তের বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল, অনন্ত বা অনন্তের স্ত্রী কিন্তু কোন মতে স্বীকার করিল না যে, নরেন্দ্রনাথ হরিহরের সন্তান। যাহা হউক, হুজুকটা দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মন্মথও খবরের কাগজে হুজুকটা পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

আমরা অনেক দিন মন্মথের সঙ্গে দেখা করি নাই; একবার দেখিয়া আসি, সে কি করিতেছে। সুরলাকে ছাড়িয়া মন্মথ হাঁটা-পথে অগ্রে কলিকাতায় উপস্থিত হন। সেখানে তুই এক বাড়ীতে রাত্রিতে অতিথি হইতে যাইলে তাহারা তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। ক্ষুৎপিপাসাতুর মন্মথ অগত্যা একটী বড়-মানুষের বাড়ীর বাহিরদিকের বারাণ্ডায় আশ্রয় লন, সেই খানেই ঘুমাইয়া পড়েন। পরদিন প্রত্যূষে সেই ধনিসন্তান, বারাণ্ডায় অপরিচিত লোক শুইয়া রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে জাগরিত করেন ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। মন্মথ আত্মগোপন করিয়া বলেন যে, তিনি কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় আসিয়াছিলেন; পথে জুয়াচোরে সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। শুনিয়া ভদ্রলোকটীর দয়া হয়

ও মন্মথকে আপনার বাসায় রাখেন। ক্রমে লেখা-পড়া জানা আছে দেখিয়া তিনি একটী অল্প বেতনের চাকরী মন্মথকে দেন। এইখান হইতে মন্মথের সৌভাগ্যের সূত্র-পাত হয়। যাঁহার নিকট মন্মথ কাজ করিতেন, তিনি এক ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। একবার এক জুয়াচোর একখানি একলক্ষ টাকার জাল চেক ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইতেছিল, মন্মথ সেটী ধরাইয়া দেন। সেই অবধি তিনি দেওয়ানের অটল বিশ্বাসের পাত্র হন। কালক্রমে নায়েবদেওয়ান অবসর গ্রহণ করিলে দেওয়ান মহাশয় মন্মথকে সেই কার্য্য দেন। তখন আফিসে অনেক পাওনা ছিল, মন্মথ অল্পদিন মধ্যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। এই সময়ে মন্মথ বিলাস-পুরে যাইয়া মুরলার সঙ্গে দেখা করিবার কল্পনা করেন। এখন আর তাঁহার সে অবস্থা নাই, তিনি এখন আপনাকে হরিহরের উপযুক্ত জামাতা বলিতে পারেন। বিশেষতঃ খবরের কাগজে মোকদ্দমার কথা শুনিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি বিলাসপুরে যাত্রা করিলেন।

এবারে প্রথমে শ্বশুরগৃহে না যাইয়া, পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহাদের বাড়ীর একটী ভগ্ন প্রকোষ্ঠে মুরলা শয়ানা, পার্শ্বে তাঁহার মাতা উপবিষ্টা; চিকিৎসক গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর শিহরিল, সংজ্ঞা যেন দেহ ছাড়িয়া গেল। সেই মুরলা, যাহার দ্বিতল গৃহে মনোহর পর্য্যঙ্কে শুইয়া নিদ্রা হইত না, আজ সেই মুরলা দীনের কুটীরে, সামান্য শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন। আর সেই

রূপরাশি, যে রূপরাশিতে মন্মথ জ্বলন্ত বহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া মন্মথ আত্মহারা হইতেন, যে রূপের প্রভায় তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইত, যাহার জন্য তিনি এত সহিয়াছিলেন, যাহার জন্য আশায় বুক বাঁধিয়া এতদিন শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিলেন, যাহার জন্য আজও হৃদয়ে ষোল আনা আশা লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, সেই রূপরাশি,—হরি হরি! তাহার এই পরিণাম!! মন্মথের বুক যে ভাঙ্গিয়া গেল! দুই হাতে কপাল ধরিয়া, মন্মথ বসিয়া পড়িলেন। চিকিৎসক ইঙ্গিতে বলিলেন, জীবনের আর আশা নাই। যদি কিছু বলিবার থাকে ত এই সময়।

তখন বলকারক ঔষধ দিয়া চেতনা হইলে, মন্মথ মুরলার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, মুরলা ইঙ্গিতে মাথার কাছে বসিতে বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুরলার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়া মিলাইল। হাসি যেন বলিল, "আজ আমার কামনা পূর্ণ হইল, আজ আমি সুখে মরিতে পারিব" সেই ম্লানমুখের ক্ষীণহাসি মন্মথের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। তখন মন্মথ মাথার কাছে বসিলে, মুরলা তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মস্তকে দিলেন, আর বলিলেন, "স্বামিন্, প্রভো! এস, আরও নিকটে এস,! আজ আমার অনেক দিনের সাধ পূরিয়াছে, আজ আমি সুখে মরিতে পারিব। প্রভো! আমি তোমার কাছে অপরাধিনী ছিলাম, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে মত্ত হইয়া তোমায় কত বলিয়াছি, যেদিনে আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাও, সেদিনে তোমার মনে কি গভীর

দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই; আজ সেই অপরাধ ক্ষমা কর। যে দিন হইতে তুমি যাও, সে দিন হইতে আমার ব্যাধির সূত্রপাত হয়। যত দিন বল শরীরে ছিল, নীরবে সব সহ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু শরীর ক্রমে অবসন্ন হইল; এখন এই দেখ, আমার কি দশা হইয়াছে। বরাবর মনে আশা ছিল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মরিব, এ পর্য্যন্ত সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পাছে দেখিতে না পাই বলিয়া সাধ করিয়া তোমাদের বাড়ী আসিয়াছিলাম। মনে ছিল, যদি নিতান্ত তোমার সঙ্গে দেখা না হয়, তবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মরিব; কিন্তু আজ আমার মনস্কামনা পূরিয়াছে। প্রভো! আজ আমায় ক্ষমা কর। আমি প্রতিদিন ভগবান্‌কে ডাকিতাম যে, আমি যদি সতী হই, তবে যেন ভগবান্, মৃত্যুর আগে তোমাকে একবার আমার কাছে আনিয়া দেন! আঃ। আজ আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। বল নাথ! বল, আজ আমায় ক্ষমা করিলে!” বলিতে বলিতে মুরলার স্বর জড়াইয়া আসিল, মন্মথের চক্ষুও জলে পূরিয়া আসিল। মন্মথ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, সতী মুরলা স্বামীর পদতলে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

মুরলার মৃত্যুর পর মন্মথের সংসারে বীতরাগ হইয়াছিল। মোকদ্দমার দায়ে পড়িয়া তদ্বির করেন, কলের পুত্তলীর মতন যে যা বলে, তাহাই করেন। শুনা যায় যে, তিনি শেষে মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু

বিষয় মন নাই। বিষয় বিক্রয় করিয়া তাহার উপস্বত্বে মুরলার নামে অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, দেবসেবা ও অন্যান্য সৎকার্য্য করেন। পরে একদিন আবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন। এবার যে তিনি কোথায় গেলেন, কেহ জানিতে পারিল না।

সমাপ্ত।

মধুমতী।

মধুমতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর আবদার।

সতীশ বাবু এইমাত্র বৈকালে বাড়ী আসিয়াছেন ; মুখ-হাত-পা ধুইয়া, বাহিরের বৈঠকখানাবাড়ীতে পাইচারি করিতেছিলেন। খানসামা আসিয়া, সুবাসিত তামাকু-ভরা আলবোলা সাম্‌নে রাখিয়া গেল। সতীশ বাবু সবে মাত্র দুই-এক টান দিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার আদরের ষষ্ঠবর্ষ-বয়স্কা ভাগীনেয়ী সরোজিনী, পিছনদিক্ হইতে আসিয়া, পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, গলা জড়াইয়া বলিল,—"মামা বাবু! আমায় তেমনিতর আর একটা তাসের বাক্স করিয়া দাও না!" সতীশ বাবু আদর করিয়া সরোজিনীকে কোলে করিয়া, মুখ-চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন,—"তোর্ মামা বাবু বুঝি কেবল তাসের বাক্স তৈয়ারি করিবার জন্য ; যা আমি বাক্স তৈয়ারি করিব না।" সতীশ বাবু যদিও 'দিব না' বলি-

লেন, তবুও তাঁহার স্বরে কি যে একটু আদর মিশান ছিল, তাহা সরোজিনী বুঝিতে পারিল ;—তাই জোর করিয়া বলিল, "না তুমি দিবে-এ—এ ; আমি বাক্স ভাঙ্গি নাই। তুমি চলিয়া গেলে, আমি তেমনি আর একটী বাক্স করিব বলিয়া তাস সাজাইতেছিলাম। ভাত খাইতে যাইতে বেলা হইয়াছিল বলিয়া, মা আসিয়া রাগ করিয়া বাক্সটী ভাঙ্গিয়া দিলেন। তারপর মা, আর আমি, কত যত্ন করিলাম, তেমন বাক্স আর তৈয়ারি করিতে পারিলাম না। তা তুমি আর একটা তৈয়ারি করিয়া দাও।"

তখন সতীশ বাবু বলিলেন, "তা সজি! ('সজি' সতীশ বাবুর আদরের ডাক ছিল) তুই একটা গান বল্, তবে আমি বাক্স তৈয়ারি করিয়া দিব।" সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ গান্টা?" সতীশ বাবু বিব্রতে পড়িলেন। কোন্ গানটা তা তিনি কি জানেন; তবে তিনি জানিতেন যে, বালিকা দু'একটী চলিত-কথার গান শুনিয়া শিখিয়াছিল; আর বড় সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিত। সতীশ বাবু তাহা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন; তবে কোন্ গান সরোজিনী শিখিয়াছে, তাহা তিনি মুখস্থ করিয়া রাখেন নাই। তা যাহা হউক, তিনি আন্দাজে বলিলেন, "সেই যে, সেই গানটা, যাহা ঝীর কোলে বসিয়া বলিতেছিলি।" তখন সরোজিনী মামার কোলে বসিয়া দুলিতে দুলিতে হাততালি দিতে দিতে বলিতে লাগিল ;—

"এক পো দুধে কি হ'বে তা বল না?
ও বড়-বৌ! এত ক'রে দিও না!

ক্ষীর হ'বে, ছানা হ'বে, মাখন হ'বে,—
আর কি হ'বে তা বল না?
নবীন যে কেশো-রুগী,—
তারে একটু দিতে হ'বে!
বৌ যে পরের ঝী,—
তারেও একটু দিতে হ'বে!
পাখীটা শুধু ছোলা খায় না,—
কর্ত্তার যে দই নইলে চলে না,—
গিন্নি যে পোড়ার মুখী,—
ক্ষীর বই তাঁর রোচে না!

সেই সুন্দরী-বালিকার মুখে গান শুনিতে শুনিতে সতীশ বাবুর নিজের শৈশবের সুখময় স্বপ্ন, চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তিনিও এক সময় সরোজিনীর মত ছিলেন। তিনিও এক সময় অমনি গান করিতে পারিতেন। তাঁহাকেও এক সময় লোকে এমনি করিয়া, নাচাইতে ভাল বাসিত। তখন পৃথিবীর কাঁটা তাঁহার পায়ে ফোটে নাই,—নিরাশার ক্রন্দন হৃদয় ভেদ করে নাই। তখন তাঁহারও পৃথিবীর মধ্যে অভাব ছিল,—অমনি একটী রকম বা অমনি একটী খেলনা পাওয়া! সতীশ বাবু ভাবিতেছিলেন,—জ্ঞান হইয়াছে অভাব বুঝিবার জন্য; তা অভাব বুঝিবার শক্তি আছে, কিন্তু অভাব দূরীকরণের শক্তি নাই কেন? যাহা চাই, তা পাই না কেন? এমন সময় বালিকার গান শেষ হইল। বালিকা বলিল, "কৈ মামা বাবু! দাও!"

মামা বাবু তখন গান শুনিয়া বালিকাকে পাইয়া বসিলেন। বলিলেন, "তা তোকে বাক্স দিব না। তুই আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের বড় নিন্দা করিস্। তুই বলিতেছিলি, দুধ খেতে পাস না!"

সরোজিনী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, কখন্ বলিলাম?" সতীশ বাবু বলিলেন, "কেন ঐ যে বলিলে; আমাদের বাড়ী সবে এক পো দুধ; তুমি ভরসা করিয়া খাইতে পার না। দাঁড়াও, এ কথা তোমার মাকে আর দিদিমাকে বলিয়া দিতেছি।"

সরোজিনী বড় বিপদে পড়িল। সরোজিনী সব করিতে পারে, কিন্তু দুধ খাইতে পারে না। সে দুধের ওপর হাড়ে চটা। আর এমনি তার অদৃষ্ট যে, তাহাকেই দুধ খাওয়াইবার জন্য যত মারামারি ধরাধরি;—বিশেষ দিদিমার! ঝীর ত দুধের বাটী হাতে করিয়া পিছুনে দৌড়িতে দৌড়িতে আর "এই টুকু খাও মা, এই টুকু খাও মা" বলিতে বলিতে মুখব্যথা হইয়া গিয়াছে; তবে দিদিমার চোখ রাঙ্গানিতে সরোজিনী বড় ভয় পাইত। তাই সরোজিনী বলিল "মামা বাবু, আর আমি ও গান বলিব না,—তোমার পায়ে পড়ি দিদিমাকে ব'ল না।"

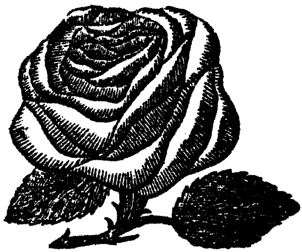
সতীশ বাবু একটু জোর করিয়া বলিলেন, "এত নিন্দের কথা না বলিলে চলিবে না।" সরোজিনী আরও মুস্কিলে পড়িল। তাইত, এই সবে মাত্র কাল রাত্রে শুইবার সময় দুধ খাইতে বলিলে সে খাই বলিয়া জানালার কাছে গিয়া দুধ বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে;—তার পর সকালে ঝী সে

কথা বলিয়া দিলে কত তিরস্কার খাইয়াছে—আর আজ আবার সেই দুধের কথা! সরোজিনী আগ্রহের সহিত সতীশ বাবুর পায়ে হাত দিয়া বলিল "মামা বাবু! তোমার পায়ে পড়ি" তখন সতীশ বাবু বলিলেন,—"তবে আর বাক্স চাহিবি না?" তা সেই ছোট হৃদয়ের অল্প অভাবটুকু,—বাক্স না পাইলে যাইবে কেন? সরোজিনী বলিল, "বাক্স দিতে হ'বে, কিন্তু দুধ খাইতে পারিব না।" সতীশ বাবু আর কথাটী না কহিয়া, বাক্স তৈয়ারি করিতে বলিতেছিলেন; এমন সময় ভৈরো সিং দরওয়ান আসিয়া সেলাম করিয়া খবর দিল, "হুজুর" তারকা চাপ্‌রাসি দরওয়াজে পর খাড়া হ্যায়, আপকে নাম-কা কুছ তার হ্যায়।" সতীশ বাবু বলিলেন, "উস্‌কো আনে কহো"।

আজ ১৫ দিন হইল, তাঁহার ভগিনী হেমলতা তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন; কিন্তু আর দু দিন আগে তাঁহার প্রিয় ভগিনীপতি সুরেশের আসিবার কথা ছিল। আসিতে বিলম্ব হওয়ায় এবং বিশেষ কোন খবর না পাওয়ায়, তাঁহারা সকলে বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন, এখন আবার টেলিগ্রাম আসিয়াছে শুনিয়া উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "জলদি আনে কহো।" নীল ও লাল রঙের মিশ্রিত টেলিগ্রাফের পেয়াদা মূর্ত্তি আসিয়া টেলিগ্রামখানি হাতে দিয়া দূরে দাঁড়াইল। টেলিগ্রাম খুলিবার সময় সতীশের বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল! না জানি বুঝি কি বিপদ ঘটিয়াছে! টেলিগ্রাম খুলিয়া সে আশঙ্কা দূর হইল। সরোজিনীকে বলিলেন, "তোমার বাবা কাল রাত্রে আসিবেন; যাও তোমার

দিদিমাকে বলিয়া আইস।" সময় বুঝিয়া পেয়াদা হাত পাতিল। সতীশ বাবু ১৲ টাকা বকশিশ হুকুম করিলেন। সরোজিনী বাবার আসিবার খবর শুনিয়া দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর সংবাদ দিতে গেল। তাহার আর বাক্স লওয়া হইল না। তখন সতীশ বাবু খোদাবকস কোচমানকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সে আসিলে তাহাকে বলিয়া দিলেন "কাল রাত ন ব'লে টীসন মে গাড়ি লে যানা, জামাই বাবু আয়েঙ্গে।" খোদাবক্স "জো-হুকুম" বলিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুরেশ-বাবু।

সরোজিনী আগে দিদিমাকে, তার পর মাকে, তাহার বাবার আসিবার খবর দিল। হেমলতা ঠানদিদির কাছে রান্নাঘরে বসিয়াছিলেন, খবর শুনিয়া তাঁহার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তার পর আঁচলে-বাঁধা একটী টাকা ভক্তির সহিত খুলিয়া দেবতা প্রণাম করিয়া আঁচলে বাঁধিলেন। সুরেশ বাবুর আসিবার দেরি দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন-চিত্তে হেমলতা দেবতার নিকট মানস করিয়াছিলেন। দুই দিন সকলে হেমলতাকে বড় বিষণ্ণ দেখিয়াছিল, আজ সেই হাসি দেখিয়া, ঠানদিদি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে বড় হাসি খুসির ধূম দেখি? তা নাৎজামাই এলে হয়, আগে কার কাছে যায় দেখি।" হেমলতা বলিল,—"ঠানদিদি! তোমার বয়স হইয়াছে, তুমি মসলা বাটিতে পার না, আমি বাটিয়া দি।"

ঠান্‌দিদি বলিল,—"বুঝিয়াছি, আগে ত এতদিন মসলা বাটিবার কথা উঠে নাই, আজ বুঝি মসলা বাটিয়া হাতে ব্যথা হইলে, চুণহলুদ দিবার লোক আসিতেছে?"

তখন হেমলতা ঠান্‌দিদির পিঠের নিকট গিয়া সেই ভিজে এলো চুল লইয়া বলিল,—ঠান্‌দিদি "দাঁড়াও, তোমার পাকা-চুল তুলিয়া দি।" এই বলিয়া পাকা-চুল তুলিতে বসিল। একটু পরে বাট্‌না বাটিতে বাটিতে ঠান্‌দিদি বলিল, "হিমি!" টান্‌দিদি অনেক কালের লোক; হেমলতাকে ছোট দেখিয়াছে, কখন একটু রাগ করিলে হেমলতাকে হিমি বলিয়া ডাকিত। তাই ঠান্‌দিদি বলিল, "হিমি"। হেমলতা ঠান্‌দিদির যে রাগ বুঝিতে পারিল না, এমন নহে;—তবে তার মনের মধ্যে কি একটা হইতেছিল, অত না ভাবিয়া একটু ডাগর-ডাকে উত্তর দিল, "কেন গা ঠান্‌দিদি?" ঠান্‌দিদি বলিল, "হিমি! কাঁচা চুল গুলি কি আর রাখ্‌বি না? সব যে ছিঁড়ে ফেল্লি!! নে ভাই, আমার ত সব সাদা হইয়াছে। আর দু গাছা কাল চুলে নাৎজামাই ভুলিবে না; নে তোর ধন তুই নে, আর কাঁচা-চুল রাখিয়া কাজ নাই।" হেমলতা তখন সসম্ভ্রমে দেখিল, সত্য সত্যই সে ঠান্‌দিদির কাঁচা চুল কতকগুলি তুলিয়াছে। একটু অপ্রস্তুতে পড়িয়া বলিল, "ঠান্‌দিদি! তোমার নাত্নীর জন্য এবার আমরা সেখানকার একখানি নূতন রকমের সাড়ী আনিয়াছি, তা শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় পরিয়া যাবে"। ঠান্‌দিদি, হেমলতা অপ্রস্তুত হইয়াছে বুঝিল; হাসিয়া বলিল, "তা আমার নাত্নী যেন নূতন রক-

যের শাড়ী পরিল, কিন্তু আশীর্ব্বাদ করি, জন্ম জন্ম তোমার যেন এই রকম ভাব থাকে।" হেমলতা ঠন্‌দিদির পায়ের ধূলার সহিত তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

ঠিক রাত্রি ৯॥ টার সময় একখানি জুড়িগাড়ি আসিয়া সতীশ বাবুর ফটকে লাগিল। সতীশ বাবু অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি গাড়ির কাছে পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতে স্থরেশ গাড়ি হইতে নামিয়া দৌড়াইয়া গিয়া সতীশ বাবুকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই সতীশ! কেমন আছ?" সেই কটী কথার মধ্যে কি একটা মধুরতা! কোমল হৃদয়ের আবেগ মিশ্রিত ছিল, সে মধুমাখা স্বর সতীশ বাবুর হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। সেই স্থরেশ,—যাঁহার সঙ্গে চিরকাল একসঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহাকে আপনার ভাইএর অধিক ভাল বাসিতেন, যাঁহাকে একদিন না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাঁহারই নির্ব্বন্ধে হেমলতার সঙ্গে যাঁহার বিবাহ হয়, সেই স্থরেশ—আজ তিন বৎসর পরে বিদেশ হইতে! সেই স্থরেশ কাছে থাকিলে হয় ত আজ সতীশের এ দশা ঘটিত না, হয় ত তাঁহার হৃদয়ের গুরুভার প্রশমিত হইত, হয় ত আর—সতীশ বাবু কি ভাবিতেছ? অতিথিসৎকার দূরে থাক, এখনও স্থরেশের কথার জবাব দিলে না ত!—জবাব পাইবার আগেই স্থরেশ সবিস্ময়ে সতীশ বাবুকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি কি সতীশ বাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছেন না? না; তিনি যাঁহার গায়ে হাত দিয়াছেন, তাঁহার যে অস্থিপঞ্জর হাতে বিঁধিতেছে। সতীশ বাবুর যে নধর কোমল শরীর, স্থরেশ

তখন সতীশ বাবুকে টানিয়া লইয়া ফটকের আলোর নীচে দাঁড় করাইলেন, মুখখানি তুলিয়া দেখিলেন, সে সতীশ আর নাই। গণ্ডস্থলের হাড় বাহির হইয়াছে, চোখে কালিমা পড়িয়াছে, চোখ কোঠরে ঢুকিয়াছে, আর সেই যত্নবিন্যস্ত আকুঞ্চিত কেশদাম—যাহার শোভায় মুখখানির দ্বিগুণ শোভা বর্দ্ধিত হইত—সেই কেশদাম কে যেন ইচ্ছা করিয়া কাটিয়া দিয়াছে! সুরেশ আবার আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, এমন দশা কে করিল"? এমন করিয়া সতীশকে কেহ অনেক দিন আদর করে নাই; তাই সতীশের চোখ্ জলে ভরিয়া গেল, গলার স্বরটা কেমন জড়াইয়া আসিল; সেই বাষ্পরুদ্ধস্বরে সতীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দশা?" সতীশ বাবুকে আর বড় বেশী বলিতে হয় নাই; সেই স্বরে, সেই আকৃতিগত বৈষম্যে, সেই জলভরা-চোখে সুরেশ বাবু বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে এমন একটা গুরুতর কিছু হইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য এই সব। তা সুরেশ সেই ফটকের আলোর নীচে দাঁড়াইয়া আর বড় পীড়াপীড়ি করিলেন না। সতীশ বাবুও যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া সাদরে সুরেশ বাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল ভাই! মুখ-হাত-পা ধোবে চল"। সেই অস্থিময়-হাত সুরেশের হাতে পড়িলে তাঁহার বুকে বড় বাজিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাইবার আগে ইহার যাহ'ক একটা প্রতিকার করিয়া যাইবেন।

সুরেশ বাবু সবেমাত্র বৈঠকখানায় গিয়া কাপড় ছাড়িতে-ছিলেন, এমন সময় জেলা-চাকরাণী আসিয়া বলিল, "জামাই-

বাবু। আসুন, মা ডাকিতেছেন।" অগত্যা সুরেশ বাবু সতীশ বাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; তখন উভয়ে বাড়ীর ভিতরে যাইলেন। বাড়ীর ভিতরে সুরেশ বাবুর জল খাইবার সময় ঠান্‌দিদি সামনে বসিয়াছিল কি না; আর সুরেশ বাবুর শ্বাশুড়ী ঠান্‌দিদির হাত করিয়া সুরেশ বাবুকে সতীশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বলাইয়াছিলেন কি না; সুরেশ বাবুর জল খাইবার সময় সাম্‌নের জানালা হইতে উজ্জ্বল দুটী চক্ষু তাহার জলখাওয়া দেখিতেছিল কি না; আর সেই দুটী চক্ষুর উপর সুরেশ বাবুর চক্ষু পড়িয়াছিল কি না; চতুরা ঠান্‌দিদি তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না; আর তাহা দেখিয়া সুরেশ বাবুকে কিছু তামাসা করিয়াছিলেন কি না;—আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। তবে এমনি নাকি একটা ঘটিয়া থাকে, তাই আমরা অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলাম; তা কি করিব? যখন ঠিক করিতে পারিলাম না, তখন পাঠকবর্গ! আপনারা যেমন একটা হউক আইডিয়া করিয়া লইবেন।

খাওয়া হইলে সতীশ বাবু কি একটা কার্য্যব্যপদেশে নীচে নামিয়া গেলেন; সুরেশ বাবুর কিছু বলিবার ছিল, যখন সতীশ বাবু ফিরিলেন না, তখন সুরেশ তাঁহার নাম ধরিয়া "সতীশ সতীশ" করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু সতীশ কোথায়? কে উত্তর দিবে? তিনি সতীশের শয়নকক্ষের দিকে যাইলেন; দেখিলেন, বাহির হইতে দরজা বন্ধ। অনুসন্ধানে জানিলেন, সতীশ বৈটকখানায় শুইতে গিয়াছেন;

শুনিয়া সুরেশের মনটা 'ছাঁৎ' করিয়া উঠিল, তবে কি সতীশ বাবু উপরে শয়ন করেন না? আর বৌ কোথায়? তা যা হউক, সুরেশ তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় যাইলেন, সেখানে সতীশ কৈ? ভৈরো সিং বলিল, বাবু বাহিরে গিয়াছেন, বলিয়া গিয়াছেন, জামাই বাবু আসিলে তাঁহাকে আজ রাত্রের জন্য আমায় খুঁজিতে মানা করিও। সুরেশ সতীশকে বেশ জানিতেন, বুঝিতে পারিলেন, সে-রাত্রে সতীশ বাবু তাঁহাকে দেখা দিবেন না; তাঁহার মনে এমন একটা কি হইয়াছে যে, যাহার জন্য সেই আগেকার মত তিনি আজ রাত্রের জন্য একা থাকিতে চান। তখন সুরেশ বাবু আর অনুসন্ধানে জেদ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে কেমন একটা অমঙ্গল-আশঙ্কা হইতে লাগিল।

"কত রাত্রে সতীশ বাবু ফিরিয়াছিলেন, ভৈরো সিং তাহার 'চার-পায়ায়' শুইয়া টের পায় নাই। কিন্তু প্রাতঃ-কালে বিছানা তুলিতে গিয়া ক্ষেমি চাকরাণী বাবুর মাথার বালিশ ভিজা দেখিয়া বলিয়াছিল "বাবু কি এই শীতকা-লের রাত্রে এত ঘামিয়াছিলে? না, এ যে দেখি, চোখের কাছটাই ভিজা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্ভাষণে।

সুরেশ বাবু সতীশকে খুঁজিতে নীচে চলিয়া গেলে, হেমলতা তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু মনটা বড় কেমন কেমন করিতে লাগিল। তাই বিছানায় না শুইয়া, তিনি সেই ঘরের এ-পাশ ও-পাশ বেড়াইতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে সুরেশ বাবুর পায়ের শব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়া পড়িলেন,—যেন কতক্ষণ ঘুমাইতেছেন। তা তাঁহার বিছানায় শুইবার শব্দ, সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সুরেশ বাবু শুনিতে পাইলেন। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সুরেশ বাবুই যে আসিয়াছেন, তাহা ঠিক জানিবার জন্য—নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য—হেমলতা একবার চক্ষু চাহিয়াই মুদ্রিত করিলেন। তা সেই চক্ষু চাওয়াটীও সুরেশের চোখে পড়িয়া গেল। হেমলতাও বুঝিতে পারিলেন, ধরা পড়িয়াছি. কিন্তু তবু চক্ষু খুলিলেন না। তখনি সুরেশ বাবু বুঝিলেন, আজ জেগে-ঘুমানর অর্থ 'অভিমান'! তাঁহার

আসিতে দুই দিন দেরি হইয়াছিল; তাই আজ এ অভিমানের উৎপত্তি। তখন স্থরেশ বাবু আদর করিয়া ডাকিলেন "লতা"। লতা বড়ই নিদ্রিত. জবাব দিল না। স্থরেশ চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া আবার ডাকিলেন, "লতা, লতে, লতি, লতু, লতিকা!" লতা এবারও উত্তর দিল না।

স্থরেশ বাবুর আদরটা এমনি রকমই হইত। আদর করিয়া ডাকিবার সময় লতার শেষ অক্ষরে আকার, ইকার, একার, উকার কত যে লাগাইতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহার এমনি আদর করা। একদিন তাঁহার প্রতিবেশী একটী স্কুলের ছোকরা শুনিয়াছিল, পরদিন সকালে সে স্থরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করে "স্থরেশ কাকা! আপনাদের এখনও কি ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে হয়?" স্থরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন"? বালক বলিল, কাল রাত্রে শুনিলাম যে, "আপমি লতা শব্দ রূপ করিতেছেন. তা আপনি ঢের ভুল করিয়াছিলেন।" স্থরেশ বাবু বলিলেন, "তা তুমিত আমার ভুল ধরিয়াছ? এখন জিজ্ঞাসা করি, যে ছোক্‌রার ভুল হয় না, সে কি পায়? বালক বলিল. "কেন সে প্রাইজ পায়।" তখন স্থরেশ বাবু বলিলেন "ঠিক কথা. তোমার ভুল হয় না, তা তুমি এই আংটী প্রাইজ পাইলে।" বলিয়া আপনার হাতের ছোট আংটিটী খুলিয়া বালককে দিয়াছিলেন।

কি বলিতেছিলাম, স্থরেশ বাবু ডাকিলেন, "লতা, লতে, লতি, লতু!" তখনও লতা উত্তর দিল না। এইবার স্থরেশ

বাবু আদর করিয়া আবার চিবুক ধরিয়া আস্তে আস্তে লতার কাণে "টু" দিলেন। লতা উঠিয়া বসিল। অমনি স্থরেশ বাবু তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়াই নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলেন। হেমলতার এইবার কৃত্রিম ঘুম ভাঙ্গাইবার পালা। সে অনেক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, স্থরেশের ঘুম ভাঙ্গিল না। তখন সেও কাণে "টু" দিতে গেল। তা কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইবার সময় স্থরেশ বাবুর মুখ, কেমন পাশ ফিরিয়া হেমলতার মুখচুম্বন করিল। হেমলতা ঠকিল। কিন্তু প্রতিশোধ দিবার জন্য তুইবার স্থরেশের গাল টিপিয়া দিলেন, তখন সোহাগে হেমলতার অভিমান ভাসিয়া গেল।

হেমলতা বলিলেন, "প্রাণাধিক! আসিব বলিয়া, না আসিয়া, তুদিন দেরি করিয়া এত কষ্ট দিলে কেন? কি বুঝিবে তুমি? এই তুদিনের জন্য এই ছোট প্রাণটুকুর ভিতর কত কাতরতা হইয়াছিল, কত অমঙ্গল,কথা মনে উঠিয়াছিল, কত দেবতাদের মানস করিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে হেমলতার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

স্থরেশ তখন সযত্নে মুখখানি বুকে রাখিয়া বলিলেন, "লতা! ইচ্ছা করিয়া দেরি করি নাই, এ দেরি হইয়াছে বুঝি তোমার দোষে।" আবার বলিলেন, "না, লতা! বুঝি কাহারও দোষ নয়! লতা, তুমি কি জান না, তুমি না থাকিলে আমি কেমন হইয়া যাই? প্রাণটা কেমন আধখানা হইয়া যায়? চারিদিক্ কেমন বেঠিক, হইয়া পড়ে? ডালের বাটী বলিয়া তুধের বাটী পাতে ঢালি? আফিসে

গিয়া নিজের নামের জায়গায় তোমার নাম দস্তখত করি? তুমি কি জাননা লতা, সাতগুণো পাঁচের মতন দেখি, তিন গুণ সাতের মতন হইয়া যায়; রামের ১ নং শ্যামকে দিই; শেষে মাতায় হাত দিয়া পড়ি। এবারেও তাই হইয়াছিল। তোমার একটা কি মনে করিতে করিতে হিসাব লিখিয়াছিলাম, অমনি হিসাবে গোল হইয়াছিল; সেই হিসাব মিলাইতে দুদিন দেরি হয়।

কথা শুনিয়া হেমলতা মুখ তুলিলেন। রাঙ্গা রাঙ্গা অধরে একটু হাসি দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল; সে হাসির অর্থ—"স্বামিন্! তোমার কথায় অবিশ্বাস করি না, আর সেই হাসির সঙ্গে বুঝি একটু গর্ব্ব মিশান ছিল, হাসি যেন বলিতেছিল, "প্রভো! তোমার হৃদয়ে দাসীর এত আধিপত্য!" তখনই সতীশের কথা উঠিলে সুরেশ বলিলেন, "লতা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, কি একটা গুরুতর কাণ্ডে সতীশের বুক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমি প্রায় ১০ বৎসর সতীশের সঙ্গে পড়িয়াছি, আমি তাহাকে বেশ জানি, কখন কখন ছেলে বেলায় মনে দুঃখ হইলে, সে একা থাকিতে ভাল বাসিত; কিন্তু আমি নিকটে গেলে, তখনই তাহার মুখে হাসি বা চোখে জল দেখা দিত, আমায় সব বলিয়া তবে সতীশ স্থির হইত; কিন্তু আজ সে রাত্রে আমার সঙ্গে দেখাও করিল না। আমার মনে বড় অমঙ্গল গাহিতেছে, তুমি কি জান বল?"

হেমলতা বলিল, "আমিও সব জানিতে পারি নাই।

দাদা কেমন এক রকম হইয়াছেন। যে দাদা—"হিমি"কে এত ভালবাসিতেন, তিনি আজ তাহার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা ক'ন না, মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি খালি কাঁদেন। তা আমি আর কাকে জিজ্ঞাসা করিব? তবে তখন ভাসা কথা যেমন শুনিয়াছি, তেমনিই বলিতে পারি।"

তখন হেমলতা বলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বিবাহের কিছুকাল পরে হরদেব রায়ের এক মাত্র কন্যা মধুমতীর সঙ্গে দাদার বিবাহ হয়। মনে পড়ে, আমরা সেই বিবাহে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলাম? সেই বিবাহের অল্পদিন পরেই আমরা চলিয়া যাই। তারপর যথাসময়ে মধুমতী নূতন ঘর করিতে আসে। শুনিয়াছি, মধুমতী বাপমায়ের একমাত্র মেয়ে বলিয়া কিছু আব্দারে ছিল। তা দাদা তাহার অন্যান্য অনেক গুণের ও চাঁদপানা মুখের জন্য বড় ভাল বাসিতেন। বড়ই সুখে দিনের পর দিন যাইতেছিল। এমন সময় কি একটা কথা উঠিল। হরদেব রায় জাতে-ঠেলা। কথাটায় প্রথমে বাবা বড় একটা কাণ দেন নাই; কিন্তু শেষে আর চাপা দিবারও উপায় রহিল না। গ্রামে দলাদলি ছিল। জাতের ঘোঁটে গ্রাম পূর্ণ হইল। ক্রমে ১টী ২টী করিয়া বাবার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইতে লাগিল। বাবার ধন-অপবাদ ছিল। ধন অপবাদের অনেক শত্রু। যাহারা আগে আগে বাবাকে বড় ভয় করিত, তাহারাই এখন ক্রমে ক্রমে বাবার পাল্টাদলে যোগ দিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই সমাজ-নিমন্ত্রণ ও হুঁকা বন্ধ হইল। বাবা বড় কৌলীন্যের অভিমানী ছিলেন। এইরূপে জাতে-ঠেলা হও-

রাতে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে বড় বুকে বাজিল। তখন মর্ম্মান্তিক হইলে গ্রামের প্রধান প্রধান লোক ডাকিয়া বাবা জাতে উঠিবার প্রস্তাব করিলেন। যাহারা বাবার পায়ের কাছে বসিতে পাইত না, আজ তাহাদেরই পায়ের নীচে বসিয়া বাবা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সেই প্রায়চিত্তে অধ্যাপক পণ্ডিত বিদায় করিতে অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল। বাবা জাতে উঠিলেন বটে, কিন্তু সে জাত্যভিমান আর রহিল না। মনের দুঃখে অভিমানে তিনি আর নিমন্ত্রণ হইলে নিজে ত যাইতেনই না, অধিকন্তু দাদাকেও যাইতে দিতেন না। কেবল সম্পর্কীয় ছোট বালক-বালিকা দিয়া নিমন্ত্রণের কাজ সারিতেন। বাবা কিন্তু হরদেব রায়ের উপর বড় চটিলেন। হরদেব রায় যে, বিবাহের সময় এ কথা বলে নাই, সে যে প্রবঞ্চনা করিয়া বিবাহ দিয়াছে,—সেই জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হরদেব রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেন না। তা তিনি প্রতিজ্ঞা করিলে কি হয়? একদিন বৈকালে বাবা বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় হরদেব আসিয়া উপস্থিত। বাবা ত কথাটীও না কহিয়া উঠিয়া গেলেন;—অধিকন্তু চাকর-বাকরেও বসিতে বলিল না,—হরদেব রায় ভগ্নমনে প্রস্থান করিলেন।

হেমলতা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "হরদেব রায় যে আসিয়াছিলেন, এ কথা গোপন রহিল না। শীঘ্রই মধুমতীর কাণে উঠিল। তখন সেই আব্দারে মেয়ে আব্দার ধরিল, 'বাপের বাড়ী যাব'। বাবা পাঠাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু একদিন প্রভাতে শুনিলেন যে, 'বৌ রাত্রে

বাপের বাড়ী চলিয়া গেছে'। দুই দিন পরে মধুমতী ফিরিয়া আসিলে, বাবা তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিলেন না। দাদা নাকি বড় জেদ করিয়াছিলেন। তাহাতে বাবা কত রাগ করেন; সুতরাং বৌকে আর ঘরে লওয়া হইল না। ইহার দুই দিন পরে নাকি একটী পুকুরে মধুমতীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। একজন জেলে তাহার গায়ের সব গহনা আনিয়া দাদাকে দিয়াছিল।

"মধুমতীর মৃত্যু সংবাদের পর দাদা কেমন হইয়া যান। তিনি আর কাহারও সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিতেন না, উপরে শোয়া বন্ধ করেন। মধুমতী যাহা ভালবাসিত, তাহাতে তিনি হাত অবধি দিতেন না। দাদার এই দশা দেখিয়া বাবা বড় চিন্তান্বিত হন। দাদার বিবাহ দিবার কল্পনা করেন। দাদা বড়ই বিবাহে নারাজ ছিলেন। তারপর ভগ্নমনে শেষ অবস্থায় ভাবিয়া ভাবিয়া বাবার ব্যায়রাম হয়। আর সেই ব্যামোতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই যে এতগুলি হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে আমরা কেবল বাবার মৃত্যু খবরটী পাইয়াছি।" হেমলতা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন।

তখন সুরেশ বলিলেন, "লত! বুঝি ঠিক হইল না। ইহার ভিতরে আরও কিছু আছে। তুমি যাহা বলিলে তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে ত মধুমতী দণ্ড পাইবার যোগ্য। যে স্বতন্ত্রা স্ত্রী, স্বামী ও শ্বশুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নিজে চলিয়া যায়, সে বাড়ীতে স্থান পাইবারই যোগ্য নয়। সে যদি মরিয়া থাকে, তা সতীশের দোষে মরে

নাই, তাহার জন্য সতীশের মনে এত গভীর দুঃখ কেন?"

কথাটা কেমন হেমলতার গায়ে বাজিল, তা হেমলতা যদি একদিন একটা ভুল করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যায়; আর তারপর ফিরিয়া আসিলে যদি সুরেশ বাবু তাহাকে পায় ঠেলিয়া দেন, আর সেই দুঃখে যদি হেমলতা আত্ম-হত্যা করে, তবে কি সুরেশ বাবু কাঁদিবেন না? তবে কি তাঁহার মনে দুঃখ হইবে না?

হরি হরি! কি হইতে কি কথা আসিল! হেমলতার ঐ কেমন এক রকম কথা, কিছু হইলে আপনার তুলনা দিয়া বসে!

তা কথাটা যাই হউক, সুরেশ বাবুকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিল। তিনি হেমলতার সঙ্গে সংসারের খেলায় চিরকাল হারিয়াছেন। প্রতিপক্ষ হইয়া খেলিতে বসিয়া হেমলতার রঙের গোলামে, সাত্তা থাকিতেও রঙের চোদ্দ বরাবর দিয়া আসিতেছেন। আজ সেই হেমলতা একটা সামান্য অপরাধ করিলে, তিনি কি মার্জ্জনা করিবেন না? কি জবাব দিবেন, সুরেশ ত ভাবিয়া আকুল হইলেন। তখন হেমলতা বলিল, "প্রভো! কি ভাবিতেছ? এখনো স্ত্রীচরিত্র বুঝিলে না? যদি ও-চরণে মন থাকে, তবে হেমলতার কি সাধ্য, শত হেমলতা আসিয়াও তোমার অনুজ্ঞা ছাড়া একপদ অগ্রসর হইতে পারে না।"

তখন সুরেশের মনটায় কেমন একটা আলো আসিয়া পড়িল। সুরেশ বলিলেন, "আমিও তাই ভাবিতেছিলাম। মধুমতী যদি যথার্থ সতীশকে ভালবাসিত, তবে তাহার

সাধ্য কি, সতীশকে না জানাইয়া বাপের বাড়ী যায়? আমার বোধ হয় ইহার মধ্যে সতীশের অনুজ্ঞা ছিল, নহিলে সতীশ এমন হইবে কেন?

কথাটা হেমলতারও মনে লাগিল। তাই ত এই সামান্য কথা হেমলতা এতদিন বুঝিতে পারে নাই। তখন দুজনে একমত হইয়া স্থির করিল যে, মধুমতী সতীশের কথাক্রমে বাপের বাড়ী গিয়াছিল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

প্রভাতে উঠিয়াই সুরেশ সতীশের অনুসন্ধানে দৌড়িলেন! দেখিলেন, ইতিপূর্ব্ব হইতেই উঠিয়া তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সতীশের মুখ ধীরগম্ভীর অথচ বিমর্ষ। যেন সে মুখ সংসারের হাওয়ায় নড়ে না,—যেন সে মুখ পৃথিবীর শোক তাপ ছাড়াইয়া আরও কোন দেশে পড়িয়াছে! মুখ দেখিয়াই সুরেশ বাবু বুঝিলেন যে, সতীশ সমস্ত রাত্রি তাঁহার প্রাণের দুঃখ জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

সুরেশ কোন কথা কহিবার আগেই সতীশ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই! কাল রাত্রে তুমি নিশ্চয়ই কিছু শুনিয়াছ, কিন্তু যাহা শুনিয়াছ, তাহা ঠিক নয়। কাল রাত্রেত আমায় আদর করিয়াছিলে, কিন্তু আজ যাহা শুনিবে তাহাতে আজ আদরের পরিবর্ত্তে ঘৃণা করিবে। ভাই! আমি স্ত্রী-হন্তা মহাপাতকী! কাল এই কথা বলিব বলিব মনে করিয়া বলিতে পারি নাই। কাল রাত্রে এই কথা বলিব বলিয়া, সমস্ত রাত্রি আকুল-প্রাণে রোদন করিয়াছি!

এতদিন এ কথা বুকে ছাপিয়া রাখিয়াছিলাম। অল্প অল্প করিয়া এই কীট আমার হৃদয় খাইয়া ফেলিয়াছে। আর পোষণ করিতে পারি না। তাই মনে করিয়াছি, ভাই! তোমাকে—জগৎকে এ কথা বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব! স্ত্রী-হন্তাকে জগতে 'স্ত্রী-হন্তা' বলিয়া জানিলেই কি জগতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইবে না?" সতীশের চোখে অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুধারা দেখিয়া সুরেশ বুঝিলেন, এখনও আশা আছে। যে কাঁদিতে জানে, তাহার শোক এখনও ঘনীভূত হয় নাই।

সতীশ মনের আবেগে বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"সকলে জানে আর কাল তুমিও শুনিয়াছ যে, হতভাগিনী শ্বশুর ও স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। মিথ্যা কথা! হরদেব ফিরিয়া যাইলে তাঁহার নিকট হইতে আর একজন স্ত্রীলোক মধুমতীর নিকট আসিয়াছিল। সে বলে যে, জাতে-ঠেলার পর হরদেব রায়ের উপর, উপর্য্যুপরি নির্যাতন চলিতেছিল। মধুমতী যে এ কথা নিতান্ত জানিত না, তা নহে; তবে ঠিক কতদূর গড়াইয়াছে, তাহা জানিত না। সেই স্ত্রীলোক বলিয়াছিল যে, হরদেব শেষে নির্যাতন সহিতে অক্ষম হইয়া বাসত্যাগের কল্পনা করিয়াছেন। তা যাইবার আগে একবার মধুমতীর সঙ্গে দেখা করিতে চান।

"এখনও সে কথা মনে করিলে, প্রাণের মধ্যে আগুন ছুটিয়া যায়। হতভাগিনী যখন এই কথা বলিয়া একবার—" হয় ত জন্মের মত একবার—তাহার পিতাকে দেখিবার জন্য

পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল, তখন আমার হৃদয় যে কেমন গলিয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। বাবাকে বেশ জানিতাম, তিনি যে মধুমতীকে যাইতে দিবেন না, তাহাও জানিতাম, অগত্যা সেই আকুল-রোদন দেখিয়া লুকাইয়া এক রাত্রের জন্য মধুমতীকে পাঠাইব ঠিক করিলাম। তার পর পাল্কী করিয়া পাঠাইলাম। কথা ছিল যে, পরদিন সকালে আসিবে। এ কথা গোপন থাকিবে। হা জগদীশ! এ কথা গোপন থাকিবে কেন? যে নরাধম, স্ত্রীর কথায় আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এ কথা গোপন থাকিলে, তাহার শাস্তি হয় কৈ? তাই রাত্রে বেহারারা পথ ভুলিয়া গেল; তাই পরদিন সকালে মধুমতী ফিরিল না; তাই বাড়ীতে সকলে টের পাইলেন। তাই বাবা গ্রহণ করিলেন না। তাই অবশেষে আমার দোষে স্ত্রী-হত্যা হইল। হায়, আমি কেন সেই সময় বাবার পায়ে তেমনি করিয়া লুটাইয়া পড়িলাম না! বাবার কি দয়া হইত না? ভাই সুরেশ! এ মহা-পাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আর প্রায়শ্চিত্ত! আমি পাপের ভার আরও বাড়াইয়াছি! আজ নিরপরাধিনী সরলাকে সর্ব্বলোকে দোষ দিতেছে যে, সে শ্বশুরের ও স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল! কৈ আমি ত এখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই যে, সে নির্দ্দোষ; দোষ সব আমার।

সতীশ মুখ তুলিলেন। সুরেশ বাবু কি জবাব দিবেন? এতক্ষণ যে অশ্রুধারা দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আশা হইয়াছিল, এখন সেই অশ্রুধারা দেখিয়াই তিনি হতাশ হইয়া

পড়িলেন। একবার মনে হইয়াছিল,—বলেন যে, জেলের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া সতীশ বাবু ভাল করেন নাই; হয় ত এখনও মধুমতী জীবিত আছে। তা সাহস হইল না। সে নিরাশ-হৃদয়ে কোন্ প্রাণে সুরেশ আশার সঞ্চার করিবে?

কতক্ষণ পরে সুরেশ বাবু বলিলেন,—"ভাই! যা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া কি করিবে? ঘটনা-স্রোত ফিরায় কাহার সাধ্য? কর্ম্মসূত্র বিধাতার হাতে; তিনিই চালাইতেছেন। তুমি, আমি কে?—কলের পুতুল বৈ ত নয়!—সংসার ঘটনার অবলম্বন মাত্র। তা দুঃখ করিয়া কি করিবে!"

সতীশ বলিলেন,—"ভাই! আমিও একদিন তোমার-মত বলিতে শিখিয়াছিলাম। দুঃখ করিয়া কিছু ফল নাই জানি; কিন্তু দুঃখ উপস্থিত হইলে কি করিব? যে নিবারণ করিতে পারে না, সে অবসান করে না কেন?"

সুরেশ বাবু বলিলেন,—"অবসানের ভোগশক্তি তোমার হাতে নয়, বিধাতার হাতে। সব না ফুরাইলে দুঃখ ফুরায় না।"

সতীশ বলিলেন,—"মিথ্যা কথা। ঐ দেখ—"

এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আলমারির মধ্যে একটী শিশি দেখাইলেন।

সুরেশ সভয়ে, সুবিস্ময়ে দেখিলেন,—শিশিটীর গায়ে "প্রুসিক-এসিড" লেখা রহিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুরোধ।

আজ চারি দিন হইল, সুরেশ চলিয়া গিয়াছেন। সুরেশ যে যাবার আগে কি-একটা প্রতিকার করিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। তবে আমরা দেখিয়াছি, সুরেশের সঙ্গে থাকিয়া, সরোজিনীর সঙ্গে খেলা করিয়া, কয় দিনের জন্য সতীশ যেন একটু প্রফুল্ল হইয়াছিলেন। সুরেশের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কিন্তু বিষাদের ছায়া সতীশের মুখে পড়িতে লাগিল।

সতীশের প্রফুল্লতার কারণ যে, শুধু তাঁহার মনের কথা বলিবার লোক পাইবার জন্য, তাহা সতীশের মাতা বুঝিতে পারেন তাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সতীশ আবার সংসারে আসক্ত হইয়াছেন।

তাই আজ বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই সতীশের মাতা সতীশের খাওয়ার পরেই সতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবা।"

সতীশ বলিলেন,—"কেন মা!"

সতীশের মাতা বলিলেন,—"বাবা! আমার যে সময় হ'য়ে এল! এ বৃদ্ধ-বয়সে আর কত দিন বাড়ীতে থাকিব? ইচ্ছা করে, কাশীবাসী হই।"

সতীশ উত্তর দিলেন,—"মা! ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

সতীশের মাতা বলিলেন,—"বাবা! আপত্তি নাই সত্য, কিন্তু এমন করিয়া তোমাকে শূন্যগৃহে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। বাবা! মায়ের কথা অবহেলা করিও না। আবার ঘর-সংসার কর, আমি দেখিয়া তীর্থবাসী হই।"

হরি হরি! আবার সেই কথা! সতীশের পিতার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়া এতদিন একথা বলিতে আর কেহ সাহস করে নাই, আজ আবার একথা উঠিল!

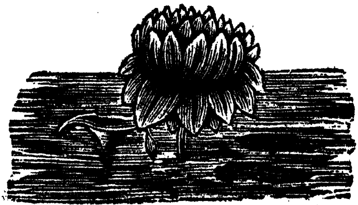
সতীশ দেখিলেন, বড় বিপদ। তাঁহার ধারণা ছিল, একবার পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, স্ত্রী-হত্যার পাতক করিয়াছেন, আবার যে এবার মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়। কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গেলে যে, আর একটী বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে হয়। তা সতীশ কি করিবেন, তিনি কি জবাব দিবেন, ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় কাঁদিতে কাঁদিতে সতীশের মাতা তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা! এ বৃদ্ধ-বয়লে আর কাঁদাস্ নে।"

সেই দৃঢ়নির্ব্বন্ধ। সেই মাতার তপ্ত অশ্রুবিন্দু! সতীশের আর বুঝি প্রতিজ্ঞা থাকে না! হায়! মধুমতী আজ তুমি কোথায়? তুমি থাকিলে আজ বুঝি এ দৃশ্য দেখিতে

হইত না। সতীশ তাঁহার মাতার হস্তে বিধাতার হস্ত ও তাঁহার মাতার অশ্রুজলে কোন অভাগিনী বালিকার অশ্রু-জল দেখিতে পাইলেন। সতীশের মাতা আজ কিন্তু বড়ই ধরিয়া বসিয়াছেন, একটা শেষ না করিয়া উঠিবেন না।

সেই সময় সতীশের মনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নিচয় যে কি একটা গণ্ডগোল করিতেছিল, তাহা আর আমরা বলিব না। কতক্ষণ পরে সতীশ সাশ্রুনয়নে উঠিয়া গেলেন।

পরদিন হইতেই ঘটক-ঘটকীর আনাগোনায় আমরা বুঝিলাম সতীশ বিবাহে সম্মত হইয়াছেন।



সুরেশ বাবু আফিসে কাজ করিতেছিলেন; হরকরা আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। সবিস্ময়ে দেখিলেন, চিঠি সতীশের হাতের লেখা। আসা পর্য্যন্ত সতীশ তাঁহাদিগকে একখানিও চিঠি লেখেন নাই। আজ তাঁহার চিঠি পাইয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলেন। দেখিলেন; লেখা রহিয়াছে,—

"ভাই সুরেশ!

অনেক দিন হইতে তোমায় চিঠি লিখি নাই, মার্জ্জনা করিবে।

তোমার যাওয়ার সঙ্গে আমার শিশিটী অন্তর্হিত হইয়াছে। বুঝিয়াছি যে, এটী তোমারই কাজ। তা শিশির সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে না কেন?

তা যাহাই হউক, আমার বিবাহ ঠিক হইয়াছে। শীঘ্র আসিবে। ভিতরের চিঠিখানি ভগিনীকে দিবে।

শ্রীসতীশ।"

সুরেশ বাবু, হেমলতার শিরোনামাযুক্ত চিঠি খানিও পড়িলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় কি বলে, জানি না, সুরেশ বাবু কিন্তু ইহাতে দোষ বোধ করেন নাই। সেই খানিতে লেখা ছিল,—

"আশীর্ব্বাদ পত্র

কল্যানীয়া ভগিনী হেমলতা,

আমার বিবাহের ঠিক হইয়াছে। শীঘ্র আসিবে। দেরি করিলে বুঝি বৌ দেখা ভাগ্যে ঘটিবে না। সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিবে।

শ্রীসতীশ।"

চিঠি পাইয়াই সুরেশ বুঝিলেন যে, সতীশ মনে মনে বিবাহ ছাড়া আরও কিছু সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বৌ দেখার অর্থ ত সতীশের সঙ্গে শেষ দেখা নয়! সুরেশের শিশিটীর কথা মনে পড়িল। তিনি আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না। চাপ্‌কানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে সাহেবের কাছে দৌড়িলেন।

সাহেব খাস-কামরায় বসিয়া চুরুট মুখে করিয়া বিলাতে মেম সাহেবকে চিঠি লিখিতে ছিলেন। সুরেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু! কি খবর?"

সুরেশ আস্তে-ব্যস্তে বলিলেন,—"বড় প্রয়োজন। ৭ দিনের ছুটি চাই।"

সাহেব বলিলেন,—"আমি এই সেদিন তোমাকে ছুটি দিয়াছি, আর ছুটি দিতে পারি না। তুমি জান, তোমায় ছুটি দিলে, আমার ক্রিকেট খেলা, রোইং ও ঘোড়দৌড়ের ক্লবের হিসাব দেখা, আফিসের অন্যান্য ভদ্র ভদ্র সাহেব ও মেমের সঙ্গে আলাপ করা ঘটিয়া উঠে না। আর তোমরা বাঙ্গালী, দুদিন পরিবারকে না দেখিয়া অস্থির হও! আর এই দেখ, আমার পরিবারকে আজ তিন বৎসর দেখি নাই, প্রতি মেলে একখানা চিঠি লিখিয়াই সন্তুষ্ট। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, তোমায় ছুটি দিতে পারিলাম না।"

সুরেশ সাহেবের অত উচ্চনীতির কথা বুঝিতে পারিতে-ছিলেন কিনা, সন্দেহ; কিন্তু নীরবে টেবিলের দিকে মুখ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন। তাঁহার মনে যে কি হইতে ছিল, তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

কিছুপরে সাহেব দেখিলেন যে, সুরেশ কাঁদিতেছে; জন্মেরমধ্যে সুরেশকে কাঁদিতে দেখেন নাই। সাহেব যে সুরেশকে ভাল বাসিতেন না, তাহা নহে; তবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা ফুরস্থত হইত না। আজ সুরেশকে কাঁদিতে দেখিয়া সাহেব বুঝিলেন যে, তাহার কিছু গুরুতর প্রয়োজন হইয়াছে; আর সে সময়ে সে কথাটা বলা ভাল হয় নাই।

তখন সাহেব বলিলেন,—"বাবু! তোমার যে এত গুরুতর প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। যাও, তোমায় ছুটি দিলাম। কিন্তু দেখিও, সাত দিনের বেশী দেরি করিও না। আর ফিরিয়া আসিয়া আমার সভা সমিতির বাকীহিসাব তুলিয়া দিও।"

সুরেশ বাবু, দুই হাতে সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন।

বাড়ীতে আসিয়া গণপতকে তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডাকিতে বলিয়া, সুরেশ, উপরে যেখানে হেমলতা সযত্নে স্বহস্তে তাঁহার জন্য বৈকালের খাবার তৈয়ারি করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হেমলতা বলিলেন,—"এমন অসময়ে শশব্যস্ত যে?" হেমলতা আর একটা কি তামাসা করিতে যাইতেছিলেন, তা সুরেশের মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

সুরেশ বলিলেন,—"লতা! শীঘ্র তোমার গহনার বাক্স ও টাকার বাক্স বাহির করিয়া লও। যদি পার ত দু'এক খানা কাপড় ও আবশ্যকীয় জিনিস লও। চল, এখনি গাড়ীতে উঠিতে হইবে।"

হেমলতা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?"

সুরেশ বলিলেন,—"চল, তোমার দাদার বিবাহ উপস্থিত। দেরি করিলে বুঝি আর বৌ দেখিতে পাইবে না।" এই বলিয়া আপনার পকেট হইতে হেমলতার চিঠিখানি ফেলিয়া দিলেন।

হেমলতা চিঠি পড়িয়া অবাক্। দেরি করিলে বৌ দেখা ঘটিয়া উঠিবে না কেন ?

তখন সুরেশ বলিলেন,—"লতা ! বুঝিতে পার নাই ? এ বিবাহ তোমার দাদার অমতে, তোমার মাতার নির্ব্বন্ধে হইতেছে ! আমার বড় সন্দেহ হইতেছে,—সতীশ কি ঘটাইয়া বসে। চল, শীঘ্র চল। অশনি, পতনোন্মুখ দেখি যদি, বুক পাতিয়া লইতে পারি।"

হেমলতা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তখনি যা পারিলেন, গুছাইয়া লইলেন। গণপত গাড়ি আনিয়া হাজির করিল। সুরেশ ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ট্রেণ ছাড়িতে সবে আধ ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব আছে। তা ষ্টেসনে পৌঁছিতেই ত ২৪ মিনিট যাইবে। বুঝি আজ আর যাওয়া হয় না। গাড়োয়ান বক্‌সিসের লোভে ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ি ছুটাইয়া দিল।

গাড়ি হইতে নামিয়া দেখিলেন, আর পাঁচ মিনিট দেরি। সুরেশ ষ্টেসনে টিকিট করিতে দৌড়িলেন। গণপত হেমলতাকে এক কামরায় তুলিয়া দিয়া সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠিক গাড়ি ছাড়িবার এক মিনিট পূর্ব্বে হাঁসফাঁস করিতে করিতে সুরেশ ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ ছাড়িলে তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

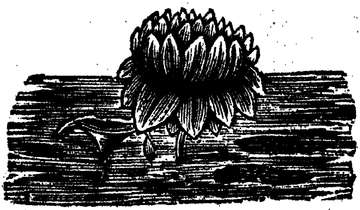
আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সুরেশ এই সময়ে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছিলেন। আর, মিথ্যা কথা বলিতে নাই, হেমলতারও এই সময় সুরেশকে একটু বাতাস করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু বাতাস না করিয়া হেমলতা সুরেশের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এমন সময় হাসি ভাল লাগে না। সুরেশ রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলেন; কিন্তু তবু সে হাসি থামিল না। তখন সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, হেমলতা তাহার পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

সুরেশ সচকিতে দেখিলেন, তাঁহার এক পায়ে কার্পেটের, আর এক পায়ে স্প্রীংওয়ালা জুতা। তা মরুক যাক। রেলির ৪৯ পরিয়া আসিবেন মনে করিয়াছিলেন; না,—ঝিয়ের একখানা সাদা ধুতি পরিয়া আসিয়াছেন! ধুতি হাঁটুর নীচে নামে নাই। ওয়েষ্ট কোর্টের বোতামগুলা দেওয়া হয় নাই। তা নাই হইল, কোট্‌টী সঙ্গে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঠিকা গাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। সরোজিনীর জন্য পথে কিছু খাবার লইয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে দুই পাত তামাক উত্তমরূপে বাঁধিয়াছেন। খাবার ও তামাক উভয়ে মিশ্রিত হইয়া অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। গোটা কতক পানের সঙ্গে তিনটা বাটার বাটী আনিয়াছেন! পেট-পকেটে হাত দিয়া দেখেন, টিকিট করিবার সময় কুড়ি টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া আসিয়াছেন। সুরেশ আপনার ভুল দেখিয়া আপনিই হাসিতে লাগিলেন। "তা হউক, এ সকলে আসে যায় না; ভালয় ভালয় এখন পৌঁছিতে পারিলে

হয়” এই বলিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সুরেশ পথে আর কোন গোল করেন নাই। গাড়িও যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছিল।

পৌঁছিয়াই অনুসন্ধানে বুঝিলেন যে, কাল বিবাহ। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল সতীশ তেমনি বৈটকখানায় বসিয়া আছেন। তেমনি বিষণ্ণ; কিন্তু নীরব, নিশ্চল। এমনি মুখ, তিনি আর এক-দিন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন সতীশ কাঁদিতে পারিয়া-ছিলেন। আজ যেন তিনি রোদনের সীমা অতিক্রম করিয়া-ছেন! সরোজিনী মামা বাবুর কাছে কি- একটা আব্দার করিবে বলিয়া লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া যাইতেছিল। সে মুখ দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসিল। সতীশও সরোজিনীকে ‘সজি’ বলিয়া আদর করিয়া ডাকিলেন না।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবীন সন্ন্যাসী।

আজ ৮ দিন হইল, কোথা হইতে গ্রামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি। তাঁহার অর্থে অনাস্থা। তাঁহার ভগবৎজ্ঞানের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। আজ প্রতি-ঘরে, প্রতি-পল্লীতে, প্রতি-মুখে সন্ন্যাসীর কথা। সন্ন্যাসী নিস্পৃহ, কাহারও নিকট হইতে কিছু লন নাই। প্রভাতে, প্রথমে যাহার নিকট হইতে একমুষ্টি তণ্ডুল পান, তাহাই গ্রহণ করেন। তারপর সমস্ত দিন নিরাহার।

দলে দলে লোক সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিত। যে আর্ত্ত, সে ঔষধ লইয়া পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিত। যে শোকার্ত্ত, সে জ্ঞানের কথা শুনিয়া হৃদয় শীতল করিত। যে দুঃখী, সে শূন্যহস্তে ফিরিত না। সন্ন্যাসী কোথা হইতে অর্থ পাইতেন, কেহ জানে না। যে জ্ঞানপিপাসু, তাহার জন্য সন্ন্যাসীর বড় আগ্রহ। সেই গভীর পাণ্ডিত্যে প্রার্থীর মনে সন্ন্যাসী, প্রেম ও ভক্তির শতধারা বহাইয়া দিতেন।

আজ শুভদিনে, সতীশের বিবাহের দিনে, সন্ধ্যার সময়

কোথা হইতে সন্ন্যাসী আসিয়া সতীশের গৃহে উপস্থিত। সন্ন্যাসী কখন তাঁহার বৃক্ষমূল ছাড়েন নাই। আজ তাঁহাকে এখানে আসিতে দেখিয়া সকলে চমকিত হইল, সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে যেখানে সতীশ বসিয়া ছিলেন, সেইখানে মৃগাজিন পাতিয়া বসিলেন। সতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস! পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। তোমার কার্য্য এখনও ফুরায় নাই; তাই জীবন—"

সুরেশের বোধ হইল, সন্ন্যাসী যেন সতীশের পরিচিত।

সতীশ বলিলেন,—"প্রভো! কি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিব? আপনি অন্তর্যামী। সকলই ত জানেন। আজ কি দেখাইব, কত শত বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা এ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে! নরকে বুঝি এমন যন্ত্রণা নাই, যাহা ইহার সমান। স্বর্গে বুঝি এমন অমৃত নাই, যাহা এ হৃদয় শীতল করিতে পারে।

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎস! এখনও তোমার আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তিমূলক। নিবৃত্তিমূলক না হইলে, তোমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইবে না।"

সতীশ বলিলেন,—"প্রভো! প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বুঝি না। ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি না। কিন্তু বিধাতার সুখময় রাজ্যে যে এত যন্ত্রণা আছে, জানিতাম না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"অধম! বিধাতার দোষ দিও না। বুঝিলাম, এখনও তোমার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হয় নাই। তবে দেখ—"এই বলিয়া, প্রাচীরের দিকে সন্ন্যাসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

সেই বিবাহ-রাত্রের উজ্জ্বল আলোকে দেওয়ালে এক অস্পষ্ট ছায়া দেখা দিল। ক্রমে ক্রমে সেই ছায়া পরিস্ফুট হইলে, সতীশ সবিস্ময়ে দেখিলেন,—মধুমতী—মধুমতী হাস্যময়ী, নির্ম্মমা, নির্ম্মৎসরা, সতীশের এত দুঃখেও স্থির, গম্ভীর, অচঞ্চল। সতীশ প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে ছায়া মিলাইয়া গেল।

তখন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! কি দেখিলে?"

সতীশ বলিলেন,—"প্রভো! যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। আর একবার দেখিতে পাই না?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন,—"বৎস! বুঝিতে পার নাই, আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির জন্য দেখাই নাই। ঐ তোমার দুঃখে অবিচল হাস্যময়ী স্বর্ণ প্রতিমা যে উপদেশ তোমায় দিয়া গেলেন, গ্রহণ কর।

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"শ্রেয়ো হিজ্ঞানমভ্যাসাৎজ্ঞানাদ্ধ্যানংবিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥"

বৎস "ত্যাগ" না শিখিলে তোমার শ্রেয় নাই। ত্যাগশিক্ষাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে আবার দেখিবে।

সতীশ শুনিলেন না। সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "প্রভো। আর একবার মাত্র দেখিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস।"

তখন সন্ন্যাসী সতীশের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। সতীশ কলের পুত্তলীর মত চলিলেন। সুরেশ কিছুদূর পশ্চাদ্গামী হইয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ক্রমে অগ্নিময়

হইতেছিল দেখিয়া সত্বর পলাইয়া আসিলেন। তারপর তিনি পুলিসে খবর দিয়াছিলে কিনা, আমরা সঠিক বৃত্তান্ত জানিতে পারি নাই।

সেই রাত্রে পরক্ষণেই সংবাদ আসিল, কন্যার গুরুতর পীড়া হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ বন্ধ থাকিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

সেই অবধি সতীশ ফেরেন নাই, সন্ন্যাসীকেও আর কেহ গ্রামে দেখিল না।

সতীশের মাতা কাশীবাসী হইলেন। সুরেশ তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

সরোজিনী তেমনি করিয়া নাচিতে নাচিতে গান বলিত। তবে মামা বাবুর কথা হইলে একটু বিমর্ষ হইয়া যাইত।

সুরেশ বাবু তেমনি করিয়া হেমলতার প্রতিপক্ষ হইয়া খেলিতে বসিলে, রঙের গোলামে সাত্তা থাকিতে ভুলিয়া চৌদ্দ দিয়া ফেলিতেন। কিন্তু হেমলতার অলক্ষে দু'একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করা সুরেশের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।

মনোরমা।

মনোরমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাতা।

"বৌ-মা বৌ-মা! একবার এ ঘরে এস"। শাশুড়ির ডাক শুনিয়া মনোরমা ঘরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার শাশুড়ি বলিলেন, "বৌ-মা! তোরঙ্গটা বন্ধ ক'রো না, এই দেখ রুমালগুলো, মোজা কয়টা, ঔষধের শিশিটা, উড়ানিখানা এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। বাছা-আমার যে, এগুলো সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে বলিয়াছিল।" এই কথা বলিয়া মনোরমার শাশুড়ি একে একে জিনিসগুলি মনোরমার হাতে দিতে লাগিলেন; কিন্তু দিবার সময় কি জানি কেমন করিয়া মনোরমার এক ফোঁটা চক্ষের জল, তাঁহার শাশুড়ির হাতে পড়িয়া গেল। তখন মনোরমার শাশুড়ি বলিলেন,

"বৌ-মা কাঁদিতেছ নাকি? বাবা, কাল বিদেশে যাবে, আজকের দিনে চোখের জল ফেলিলে বাছার অকল্যাণ হবে। ছি মা! কেঁদো না।" কিন্তু মনোরমার চক্ষু ত সে নিষেধ শুনিল না। এতক্ষণ পাছে শাশুড়ি টের পান বলিয়া, মনোরমা কষ্টে আত্মসংযম করিতেছিল, কিন্তু আর পারিল না। বিশেষ শাশুড়ির করুণ স্নেহের কথায় মনের আবেগ উথলিয়া উঠিল। দরবিগলিত-ধারায় মনোরমার অশ্রুধারা বহিল। মনোরমার শাশুড়িও এতক্ষণ পাছে বাছার অকল্যাণ হয় বলিয়া, চোখের জল চোখে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রবধূর অশ্রুধারা দেখিয়া তাঁহারও রুদ্ধ বাষ্প বহিল। তখন শাশুড়ি ও বধূ একসঙ্গে কাঁদিলেন। কিছুক্ষণ পরে মনোরমার শাশুড়ি বলিলেন, "যাও মা! জিনিস গুলো গুছাইয়া লওগে, এখনি আসিব। যাই আমি খাবার-দাবার ঠিক করিয়া রাখিগে", বলিতে বলিতে নগেন্দ্র ঘরে আসিলেন। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া মাকে খাবার দিতে বলিলেন। খাবার সময় নগেন্দ্রের মাতা সামনে বসিয়াছিলেন। তিনি একবার বলিলেন,—

"বাবা"!

নগেন্দ্র উত্তর দিলেন "কেন মা?"

যে মর্ম্মভেদী করুণ স্বরে কথা কয়টী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা কেবল ভাবী-অদর্শন-শোকার্ত্ত মাতা ও পুত্রের কণ্ঠে সম্ভবে। এই কয়টী কথায় মাতার কি এক অসীম স্নেহ, পুত্রের কি এক অসীম ভক্তি প্রকাশ করিতেছিল, তাহা সেই মাতা ও পুত্র ছাড়া আর কে বুঝিবে? সেই

"কেন মা" শুনিয়া নগেন্দ্রের মাতা চক্ষু মুছিলেন, আর সেই "বাবা" কথা শুনিয়া "কেন মা" বলিবার সময় নগেন্দ্রের স্বরটা কেমন জড়াইয়া আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে নগেন্দ্রের মাতা আবার বলিলেন,—

"বাবা! কালই কি যাওয়া ঠিক?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঠিক বৈকি মা! সাহেব আজ আবার তারে খবর পাঠাইয়াছেন, কাল না রওনা হইলে, কাজ পাওয়া ভার হইবে।"

নগেন্দ্রের মাতা আবার বলিলেন,—"দেখিস্ বাবা, পৌঁছিয়াই চিঠি দিতে ভুলিস্ না"—আর যেমন যেমন থাকিস্, রোজ একখানা করিয়া চিঠি দিবি।"

নগেন্দ্র বলিলেন "দিব বৈকি মা!"

নগেন্দ্রের মাতা তখন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিলেন, বাছা আমার কখন বিদেশে যায় নাই, বিদেশের কষ্ট কখন জানে না, আমি কাছে না বসিলে বাবার আমার খাওয়া হয় না। কাল বিদেশে কে তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবে? আর যদি সেখানে অসুখ হয়—ছি! অমঙ্গলের কথা ভাবিতে নাই, তা কি করিব, ঐ কথাই ত আগে মনে আসে। না, ও-কথা আর ভাবিব না, মা কালী, বাবার দেহ ভাল রাখুন।" নগেন্দ্রের মাতা এই সব কথাই মনে তোলাপাড়া করিতে-ছিলেন। এমন সময় তিনি অন্যমনস্কে শুনিলেন, "চিঠি দিব না"।

নগেন্দ্রের মাতার চমক ভাঙ্গিল,—কি সর্ব্বনেশে কথা। নগেন্দ্রের মাতা ত একদিনের জন্য নগেন্দ্রকে অযত্ন করেন

নাই, তবে নগেন্দ্র চিঠি লিখিবে না কেন? নগেন্দ্রের মাতা আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, চিঠি দিবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন "সে কি মা! আমি ত 'চিঠি দিব না' বলি নাই।"

তবুও নগেন্দ্রের মাতার মনটা কেমন বুঝিল না। যেন মনে হইল, নগেন্দ্র জন্মের মত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। তিনি মনকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু মন ভাল বুঝিল না, কেমন যেন একটা গোলমাল রহিয়া গেল। তখন ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া, নগেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "যাও বাছা শোওগে। রাত্রি অনেক হইয়াছে। কাল আবার সকাল সকাল উঠিতে হইবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী।

মনোরমা আজ বিনিদ্র হইয়া জিনিস পত্র গুছাইতেছিলেন। এটা তিনি বড় ভালবাসেন, ওটা সঙ্গে না থাকিলে চলিবে না. এটা তাঁহার সখের জিনিস বলিয়া রাজ্যের খুটিনাটী তোরঙ্গের মধ্যে পুরিতেছিলেন। নির্জ্জীব তোরঙ্গ অনেক জিনিস উদরস্থ করিয়া হাঁ বন্ধ করিতে পারিতেছিল না; তা মনোরমা কি করিবে, এসব জিনিস যে না হইলে নয়, তাই মনোরমা তোরঙ্গের হাঁ বুজাইবার জন্য তাহার সঙ্গে অনেক বচসা, শেষে মারামারি পর্য্যন্ত করিতেছিলেন। এমন সময় নগেন্দ্র শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সাঁজের বাতি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কে জ্বালিয়া রাখিল?" মনোরমা সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই ঘুমাইতেন বলিয়া, নগেন্দ্র তাঁহাকে আদর করিয়া "সাঁজের বাতি" বলিয়া ডাকিতেন।

মনোরমা মুখ তুলিলেন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া আর সে কথা বলা হইল না। সেই বিষাদমাখা মুখে হৃদয়ের কত মর্ম্মকথা,

কত ভালবাসা, কত যাতনা, কত আশঙ্কা আপনাআপনি প্রকাশ পাইতেছিল। তখন সেই বিষাদ কোথা হইতে জল-সঞ্চয় করিয়া মনোরমার চক্ষে অশ্রুধারা বহাইল। মনোরমা অনের যত্নেও সে অশ্রুধারার গতি রোধ করিতে পারিল না। নগেন্দ্র অনিমেষ-নয়নে সেই মুখখানি দেখিতেছিলেন, মরি মরি কি সুন্দর শোভা! সেই দীপ্ত প্রদীপের উজ্জ্বল প্রভা আরক্তিম গণ্ডস্থলে সুন্দর কি প্রতিভাত!! আর তাহার উপর প্রবহমান অশ্রুধারা, শতদল পত্রের উপর মুক্তাপঙ্‌ক্তি, সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন রোদনে বিস্ফারিত—আর করুণ ভাবব্যঞ্জক সেই বিলোল কটাক্ষ! নগেন্দ্র ভাবিতেছিলেন, স্বর্গে দেবতার কি আছে, যাহা এই রূপ-সমষ্টির তুল্য। আর ভাবিতেছিলেন, তিনি না-ই বা বিদেশে গেলেন? যে রূপের সমাবেশে তিনি মুগ্ধ, যে গুণের সমাহারে তিনি আত্মহারা, আর যে রূপ-গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সুখী করিতে, আজ বিদেশে যাইতেছেন, তিনিই যে আজ তাঁহার গমনে অসুখী। তা নগেন্দ্র না হয়, না-ই গেলেন? হরি হরি! তাও কি আজ সম্ভব? নগেন্দ্র যে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উপর দারিদ্র্য-দৈব অদূর হইতে ভ্রূকুটি করিতেছে। আজ কেমন করিয়া নগেন্দ্র প্রত্যাহার করিবেন!

কি বলিতেছিলাম। নগেন্দ্র অনিমিষনয়নে সেই মুখখানি আজি দেখিতেছিলেন। দেখিয়া দেখিয়া ত আশা মিটিল না। তখন নগেন্দ্র সেই মুখ অমনি বুকে ধারণ করিলেন। সে মুখ বুকে থাকিয়া কত কাঁদিল। নগেন্দ্রকে কত মর্ম্ম-

বেদনা জানাইল। কত মর্ম্মবেদনা বুঝিল। কিন্তু উপায় ত আর দেখিল না। আজ রাত্রি শুদ্ধ—আজ রাত্রি মাত্র!! আবার কত দিন পরে দেখা হইবে।

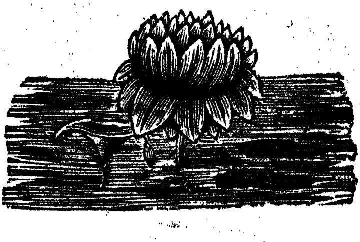
নগেন্দ্র মুখ বুকে করিয়া ভাবিতেছিলেন, এমনি করিয়া সারা জীবন কাটে না?

মনোরমা মুখ বুকে রাখিয়া ভাবিতেছিলেন, যদি আজিকার রাত্রি না পোহায়!

রাত্রি কিন্তু মাথার উপর দিয়া কোথা দিয়া পোহাইল। মনোরমা শুনিলেন, উষা সমাগমে পক্ষীরা প্রভাতী গাইতেছে।

তখন মনোরমা বলিলেন, "রোজ চিঠি দেবে ত?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তুমি জবাব দিতে দেরি করিবে না ত?"



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বরৃত্তি।

তুমি আমি আশায় বুক বাঁধিয়া কার্য্য করিবার আগে যদি কার্য্যের ভিত্তি একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতাম, তবে বুঝি' আশাভঙ্গের জন্য আমাদের অর্দ্ধেক মনস্তাপ পাইতে হইত না। অনেক কষ্টে অনেক যত্নে ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, আর একতলা হইলেই আমার অসীম আশা পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রথমে তাড়াতাড়িতে অতটা ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। পাকা মিলে নাই বলিয়া খানিক বনেদ যে কাঁচা করিয়াছিলাম, এখন আর ত্রিতলের উপর ভার সহিবে কেন? গাঁথিতে গাঁথিতে সব যে ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা আশাবৈতরণী নদীর পার লক্ষ্য করিয়া এত-দূর আসিয়াছি, আর কি অপর পারে উঠিতে পারিব না? আসিবার সময় ভাবি নাই যে, অপর পার বড় পিচ্ছিল, বিনা যষ্টির সাহায্যে দাঁড়াইতে পারিব না। যষ্টি আনি নাই বলিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। তাই আজ আমার

এত আশাভঙ্গের মনস্তাপ। কাহার দোষ দিব? দোষ ত নিজের অর্ব্বাচীনতার। অদৃষ্টবাদী কিন্তু বলিবেন, মানুষ ভবিষ্যৎ-অন্ধ; ভবিষ্যৎ যা তাহাকে আনিয়া দেয়, তাই তাহাকে লইতে হইবে। শত সমীচীন হইয়া কাজ করিলেও ফল তোমার আমার আশাভঙ্গ।

তা তুমি আমি যাহাই বলি, নগেন্দ্রের কিন্তু আশার সুফল ফলে নাই। অনেক আশা করিয়া বিদেশে চাকরি করিতে গিয়াছিলেন। শ্রমসহিষ্ণুতা, উদ্যমশীলতা, যৌবন তাঁহার মূল ধন ছিল; কিন্তু আসিবার সময় তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এমন করিয়া তাঁহার মনটা ফেলিয়া আসিতে হইবে। জন্মাবধি কখন স্বদেশ ছাড়েন নাই, তার একেবারে আসিয়া পড়িলেন, ছাতুখোরের দেশে! [illegible] কষ্টে দুজন স্বদেশী মিলিল, তা [illegible] সঙ্গে মন মিলিল না। তা নাই মিলুক, কার্য্যক্ষেত্র ত অনেক বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কাজ করিবে কে? নগেন্দ্র সদাই অন্যমনস্ক থাকিতেন। দিন কতক দিন রাত চিটিই লিখিতেন। মনোরমার জবাব দিয়া উঠিবার সময় হইত না। তার পর মনোরমার জবাব দিতে একদিন দেরি হইলে কত রাগ হইত। বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যেও দিনকতক চিঠিটা খুব চলিয়াছিল। ডাক আসিবার এক ঘণ্টা আগে হইতে নগেন্দ্রের মনটা কেমন কেমন করিত, আর চিঠি পত্রের জবাব দেওয়া হইয়া গেলে পৃথিবীটা কেমন ফাঁক ফাঁক ঠেকিত। কোন কার্য্যেই মনোভিনিবেশ করিতে পারিতেন না, তাই অত ভুলচুক হইত। শেষে ফল দাঁড়াইয়াছিল যে, নগেন্দ্র যাহার নিকট চাকরি করিতে যান,

সেই সাহেবেরই বিরাগভাজন হইয়া দাঁড়ান। নগেন্দ্র নিজের মনের দর বোঝেন নাই, পরের মন আকর্ষণ করিবেন কিরূপে?

তাই আজ নগেন্দ্রের চাকরিতে অবনতি হইল। এ মনস্তাপ যে নগেন্দ্র কিরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর আমাদের লিখিতে ইচ্ছা করে না। এই অবনতির কথা, নগেন্দ্রের বন্ধু বান্ধবদের কথা দূরে থাকুক, মনোরমাও টের পান নাই। নগেন্দ্র পূর্ব্বের মত বাড়ীতে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু এই অবনতিতে কষ্টে তাহার খরচ সংকুলান হইত। এই অবনতির সঙ্গে নগেন্দ্রের চিঠি লেখা কিছু কমিয়াছিল। ... অবশ্য আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন, 'একি?' কিন্তু নগেন্দ্রের বন্ধু বান্ধবেরা পূর্ব্ব ... তাঁহার অদর্শনে তাঁহাকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন একেবারে জবাব দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। হায় শৈশববন্ধু! একবার তোমার সেই শৈশবের অকৃত্রিম স্নেহ মনে কর। প্রতিদান না পাইয়া যে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে! একদিন না দেখিয়া যে থাকিতে পারিতে না? আর আজ দুর্দ্দশার দিনে একবার যে মুখ তুলিয়াও চাহ না! আজ পথে দেখা হইলে ঘাড় নাড়িয়া "ভাল আছ ত" ছাড়া আর কি কিছু জিজ্ঞাসা করিবে?

আর মনোরমা পূজার ছুটিতে এখনও প্রিয়তম পতির আগমন অপেক্ষায় বসিয়া আছে, কল্পনা-রাজ্যে সুখের স্বপ্ন দেখিয়া কত কি ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে; কেমন করিয়া লিখিব? মনোরমে! তোমার ও সুখের স্বপ্ন পূরিবে না।

নগেন্দ্র পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবার প্রার্থনা করিয়া-

ছিলেন। সাহেব হুকুম দেন নগেন্দ্রের কাজে অনেক বাকী পড়িয়াছে। বাকী শেষ না হইলে তিনি ছুটি পাইবেন না। নগেন্দ্রের এতদিনের যত্ন-প্রতিপালিত আশা শুকাইয়া গেল।

বিরাগে ও দুঃখে নগেন্দ্র পূজার সময় বাড়ীতে চিঠি লেখেন নাই।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যার সময় নগেন্দ্র একা বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় প্রফুল্লকুমার দেখা দিলেন। প্রফুল্লকুমার চিরকালই প্রফুল্ল। আজ বিদেশে বিজয়ার দিনও তাহার মুখে হাসি ছাড়া নাই। প্রফুল্লকুমারের চরিত্রের দোষে নগেন্দ্র তাহাকে প্রথম প্রথম বড় একটা দেখিতে পারিতেন না, কিন্তু পরে তাহারই সেই হাসিমুখের বড় হিংসা করিতেন। নগেন্দ্রনাথ অনেক দিন হইতে ভাবিতে-ছিলেন, "প্রফুল্লও তাঁহার মত একা; তবে তাহার এত আমোদ কেন?" কি করিলে তিনিও অমনি হাসি-খুসি করিতে পারেন!" নগেন্দ্র ভাবিতেন, প্রফুল্লের চরিত্র দূষিত; ছি, উহার সহিত মিশিয়া কাজ নাই, লোকে কি বলিবে?" আবার মনে করিতেন, "হ'লই বা, লোকের যাহা ইচ্ছা, বলুক না কেন, তাঁহার সময় অমনি হাসি খুসিতে কাটিলেই হইল।" অনেকবার প্রফুল্লকে দেখিয়া নগেন্দ্রের মনে এমনি একটা গোলমাল হইত। তা যা হউক, আজ বিজয়ার দিনে প্রফুল্লকে দেখিয়া নগেন্দ্র সাদরে

বসিতে বলিলেন। প্রফুল্ল বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বাড়ী যাও নাই যে?"

নগেন্দ্র বলিলেন,—"ছুটী পাই নাই।" তখন নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাড়ী যাও নাই যে?" প্রফুল্ল বলিলেন, "আমার বাড়ী কি আছে? কোথায় কাহার কাছে যাইব? যাহার তিনকুলে আপনার বলিতে কেহ নাই, তাহার সর্ব্বত্রই বাড়ী!"

এই বিজয়ার দিনে একজন বাঙ্গালীর তিন কুলে কেহ নাই বলিয়া স্বদেশে যাওয়া হয় নাই, কথাটা নগেন্দ্রের কাণে কেমন লাগিল। এতদিন নগেন্দ্র প্রফুল্লের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করেন নাই, তাই এ কথা জানিতেন না; জানিতে পারিয়া ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেকি, কেমন কথা?"

প্রফুল্ল বলিলেন,—"কথা এমনিই, কথা ঠিক। ছিল সব, এখন কিছুই নাই; যাহারা ছিল, যাহারা থাকিবার, সবই যে চলিয়া গেল; কত ডাকিলাম, কেহত ফিরিয়া দেখিল না! এখন বুঝিয়াছি, কেহ কাহার নয়। যখন যেখানে, তখন সেখানে; তা ভাবিয়া কি করিব? না, ও কথায় আর কাজ নাই।"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সুপ্তস্মৃতি প্রফুল্লের মনকে বড়ই কষ্ট দিতেছে, তখন ওকথা ছাড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা লোকে মদ্যপায়ী বলিয়া তোমার বড় একটা দুর্নাম করে। বিদেশে বাঙ্গালীর ও দুর্নামের ভাগটা ছাড়িলে চলে না?"

প্রফুল্ল বলিলেন,—কই চলে? একটা নেশা না রাখিলে

প্রাণ বাঁচে কই? তোমাদের সংসারের নেশা আছে; স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিব, তাহাদের সুখী করিব, নিজে কৃতী হইলে সংসারে যশ লাভ করিব, তাই তোমাদের কার্য্যে উৎসাহ; আর আমার,—আমার যে সংসারের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে, আমার যে আর বাঁধিবার কেহ নাই, তাই নিজের আমোদে নিজে মত্ত, তাই আমার এ নেশার অবতারণা। সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর গাঁজা না খাইলে চলে না। আমি না হয় গাঁজার জায়গায় মদ খাই, তাতে কি আমার এত দোষ?"

প্রফুল্ল মদ্যপায়ীই হউন আর যাহাই হউন, তাঁহার মনটা বড় সরল। বাস্তবিক তাঁহার তিনকুলে কেহ ছিল না। তাই তিনি যাহা উপায় করিতেন, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন; তাঁহার অধিকাংশ অর্থই সুরাদেবীর উপাসনায় ব্যয়িত হইত, আর তাহারই প্রসাদে তাহার চিরকাল হাসিমুখ ছিল।

প্রফুল্লের অবস্থার সঙ্গে নগেন্দ্রের আপনার অবস্থার তুলনা করিতেছিলেন। প্রফুল্লের ত কেহই নাই, তাঁহার যে সব থাকিয়াও কেহ নাই। প্রফুল্লের আশা নাই, তাহার হৃদয়ের যাতনায় ক্রমশঃ মরিচা ধরিতেছে, নগেন্দ্রের আশা আছে, তাই তাঁহার মর্ম্ম-বেদনা নিরন্তর উজ্জ্বল। তীব্র বেদনায় শান্তি নাই। আজ বিজয়ার দিনে তাঁহার যে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল। আজ কিরূপে তিনি প্রফুল্লের মতন সব ভুলিয়া হাসিতে পারেন!

নগেন্দ্রকে নিতান্ত বিমর্ষ দেখিয়া প্রফুল্ল বলিলেন,—"কি ভায়া! আবার বাড়ীর কথাটা মনে পড়েছে নাকি? একদাগ মহৌষধ

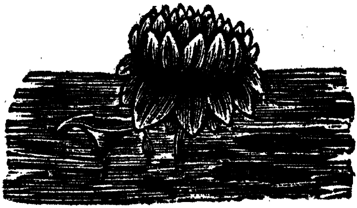
দিব কি? এখনি মনের দুঃখটা হাওয়া হয়ে যাবে। আজ বিজয়ার দিনে অমনি মুখ কি ভাল দেখায়?"

বাস্তবিক আজ বিজয়ার দিনে দুঃখের গুরুভার নগেন্দ্রের হৃদয়কে প্রণমিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার অনেক দিনের হৃদয়ের সযত্নে পরিপোষিত আশা আজ নিরাশায় পরিণত। আজ নগেন্দ্র বিজয়ার দিনে বাড়ী থাকিলে কি করিতেন? আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের মুখের সঙ্গে মনোরমার মুখ মধ্যপ্রতিমা হইয়া তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল। স্নেহময়ী মাতার আশীর্ব্বাদ আজ আর তাঁহার শিরে বর্ষিত হইল না; নগেন্দ্র যতবার এই সব কথা মনে করিতেছিলেন, এক একবারে একটী করিয়া মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইতেছিল।

প্রফুল্লের কথা শুনিয়া নগেন্দ্র ভাবিলেন, ক্ষতি কি? এ দুঃসহ দুঃখের প্রশমনকারী ঔষধ যদি থাকে, তবে সেবন করিতে দোষ কি? আর তাহাও আজকার দিনের জন্য বইত নয়? কিন্তু নগেন্দ্র সাবধান! অধঃপতনের পথ বড় প্রশস্ত, দেখিতে সুন্দর। এক-দিনের অধঃপতন এক জন্মে প্রতিকার হয় না। নগেন্দ্র প্রফুল্লের কর মর্দ্দন করিলেন। প্রফুল্লের সঙ্গে মহৌষধ ছিল। দেখিতে দেখিতে বিষ নগেন্দ্রের মাথায় উঠিল। নগেন্দ্র দেখিলেন, জগৎ ঘুরিতেছে, কিন্তু এখনও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের মুখের সঙ্গে মনোরমার মুখ মধ্য-প্রতিমা হইয়া নগেন্দ্রের চোখের সম্মুখে! নগেন্দ্র হাত দিয়া সরাইয়া দিতে গেলেন। গতিক বুঝিয়া প্রফুল্ল বলিলেন, "আর এক গ্রাস দিব কি?" নগেন্দ্র হাত পাতিলেন; প্রফুল্ল আবার দিলেন। তারপর কি করিয়া নগেন্দ্রের মাথায় উপর দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল, ঠিক জানি না; শেষ রাত্রে

নগেন্দ্র মনোরমার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, মনোরমা আকুলভাবে তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিতেছে। নগেন্দ্র পা জোর করিয়া সরাইয়া লইতেছিলেন, মনোরমা কিন্তু ছাড়ে না। তখন নগেন্দ্র আরক্ত-লোচনে বলিলেন, "মনোরমে!" নগেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগ্রত হইয়াও নগেন্দ্র শুনিলেন, এখনও "মনোরমে" তাঁহার কাণে বাজিতেছে।

সেই বিজয়ার রাত্রে নগেন্দ্রনাথের দীক্ষা হইল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুত্রের ব্যবহার।

ইদানী কি চিঠি পত্রের জবাব দেওয়া, কি বাড়ীতে টাকা পাঠান, কোন কাজই নগেন্দ্রের নিয়ম-মত হইত না; মনোরমা কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চিঠি লিখিতেন, তাহার চোখের জলে কত চিঠির অক্ষর ভিজিয়া যাইত; তাহাতেও নগেন্দ্রের উত্তর মিলিত না। তিনখানি চিঠির পর কখন দুই ছত্রে জবাব আসিত, কখন আসিত না। নগেন্দ্রের বৃদ্ধ মাতা রোজ জিজ্ঞাসা করিতেন "বৌ-মা! বাবা আজ আর কি কোন চিঠি লিখিয়াছে?" মনোরমা কি উত্তর দিবেন, তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া তাহার শ্বাশুড়ি সব বুঝিতে পারিতেন। মনোরমা ও তাঁহার শ্বাশুড়ি কত অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেন, কত ভাবিতেন; কিন্তু নগেন্দ্রের তাহাতে কি আসে যায়?

সেই রাত্রে, নগেন্দ্রের বিদেশ যাবার পূর্ব্ব রাত্রে, বৃদ্ধার মনে যে একটু মেঘ দেখা দিয়াছিল, সে মেঘ যায় নাই। একদিন

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধা মনোরমাকে বলিল, "বৌ-মা! আজ আমার শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে, বুঝি আর বাবার সঙ্গে দেখা হইবে না।" মনোরমা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলেন, তাহার শাশুড়ির প্রবল জ্বর হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সের জ্বরে কি জানি কি হয়? ভয়ে মনোরমা এতটুকু হইয়া গেলেন। যথাসম্ভব চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু চিকিৎসক আসিলে মনোরমার শাশুড়ি প্রায়ই বলিতেন, "তোমরা কি দেখিতেছ? আমি নিজের শরীর নিজে তোমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝি; আমার গঙ্গাতীরে লইয়া চল।" আবার ঔষধ খাইবার সময় মনোরমা মাথার শিয়রে দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া ঔষধ খাইতেন; বলিতেন, "বৌমা! আমার সংসারের সুখ অনেক দিন ফুরাইয়াছে। যাহাদের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়াছিলাম, তাহারা ত দেখিয়াও দেখে না। এতদিন কোন্ কালে এই মাটির দেহ, মাটিতে মিশাইত। কেবল, মা ঘরের লক্ষ্মী আমার, তোমার যত্নে এতদিন নিশ্বাস বহিতেছিল। যদি আবার মেয়ে-মানুষ হইয়া জন্মাইতে হয়, আবার যেন তোমার মত লক্ষ্মী বৌ পাই। আর কেন মা, আমায় ঔষধ খাওয়ানো!" মনোরমা কাঁদিয়া উঠিতেন, আবার বৃদ্ধা ঔষধ গলাধঃকরণ করিতেন। কিন্তু এমন অনেক দিন করিতে হয় নাই। ক্রমে রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া, নগেন্দ্রের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া বৃদ্ধাকে গঙ্গাতীরস্থ করিল। সেখানে "হরিনাম" করিতে করিতে বৃদ্ধার প্রাণবিয়োগ হইল। বৃদ্ধবয়সে নগেন্দ্রের অত্যাচার হইতে ভগবান তাঁহাকে নিস্তার করিলেন।

শাশুড়ির মৃত্যুর পর, মনোরমা অনেক কাঁদাকাটা করিয়া নগেন্দ্রকে মৃত্যু-সংবাদ দিয়া লিখিলেন, "তুমি একবার এস।"

নগেন্দ্র লিখিলেন, "এখন যাইবার সময় নাই, সময় পাইলেই যাইব।"

মনোরমা ভাবিলেন, "একি হইল! নিজের অদৃষ্টকে কত দোষ দিলেন; দেবতাদের নিকট কত মানস করিলেন; কত মাথা খুঁড়িলেন; ভগবান্‌কে কত ডাকিলেন, "হে ভগবান্! আমার স্বামীর মতি-গতি পরিবর্ত্তন কর।" কেহই কিন্তু মনোরমার দিকে মুখ ফিরিয়া চাহিলেন না।

সময় তোমার আমার জন্য অপেক্ষা করে না। মনোরমার জন্যও অপেক্ষা করিল না। এত কষ্টেও মনোরমার দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু দিনের পর দিন, নগেন্দ্র মনোরমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ময়রা-দিদি।

মনোরমার শ্বাশুড়ি মৃত্যুর পর, ময়রা-দিদি মনোরমার বাড়ী যাওয়া আসা কিছু বাড়িয়াছিল। ময়রা-দিদির গতি বিধি সর্ব্বত্র। বিশেষ তন্ত্রমন্ত্রকরণে তাহার একটা খ্যাতি ছিল। যেখানে বাল-বিধবা একাদশীর উপবাসে কাতর, সেখানে ময়রা-দিদি সান্ত্বনা করিতে বড় ঘন ঘন যাওয়া-আসা করে। যেখানে নববধূ রাত্রে শ্বশুর-বাড়ী হইতে বাপের-বাড়ী পলাইত, সেখানে ময়রা-দিদি ঔষধকরণে সিদ্ধহস্ত। যেখানে লম্পট-স্বামী হতভাগিনী স্ত্রীর মুখাবলোকন করিত না, সেখানে ময়রা-দিদির ঔষধ প্রায় ব্যর্থ হইত না। আর যেখানে ধনধান্যে গৃহস্থের ষোল আনা ভরপুর, সেখানে ময়রা-দিদির মিষ্টবাক্যে এক কাঠা ধানভিক্ষা নিষ্ফল হইত না।

ময়রা-দিদি মনোরমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতেছিল, "ও বৌ, তোর মাথায় তেল নাই, চুলটা বাঁধা নাই, মুখে হাসি নাই! এমন ক'রেও কি থাকিতে হয়?"

মনোরমা বলিল,—"তা হউক"।

ময়রাদিদি তা বুঝিল না, জোর করিয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া মনোরমার চুল বাঁধিয়া দিল। তার পর আর্শিখানি সমুখে আনিয়া দিয়া বলিল, "দেখ্ দেখি কেমন দেখায়?"

সেই যৌবনের ষোলকলা, সেই ভাদ্রমাসের ভরা গাঙ মনোরমার শরীরের উপর খরস্রোতে বহিতেছিল। পতি-বিরহ-বিধুরা অভাগিনী চিন্তায় এত ম্রিয়মাণা, তবুও তাঁহার স্বাভাবিক রূপের জ্যোতি এখনও যায় নাই। এখনও সেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ভস্মাপগমে আপনার তেজে চারিদিক আলো করে।

মনোরমা কি ভাবিয়া দর্পণে মুখ দেখিল না। ময়রাদিদি মনে করিতেছিল, যাহাদের রূপ আছে তাহারা রূপের ব্যবহার জানে না কেন? আর এমন রূপ! ছি! ছি! এ রূপ কি কুটীরে পড়িয়া শুকাইবার জন্য!

ময়রাদিদি আবার বলিল, "বৌএর কি সুন্দর গোলগাল মাট মাট হাত দুখানি! এহাতে সোণার বালা কি সুন্দর মানায়।" মনোরমা বলিল, "কোথা পাইব সোণার বালা? যাহার দুসন্ধ্যা আহার জোটা ভার, সে সোণার বালা কোথায় পাইবে? আর পাইলেই বা? কাহার মনস্তুষ্টির জন্য সোণার বালা পরিবে।" মনোরমার চক্ষু দুটি ছলছল করিতে লাগিল।

ময়রাদিদি বলিল, "বলি তা নয়, আমি তোমার মনে কষ্ট দিবার জন্য কোন কথা বলি নাই। তবে কি জান, ও পাড়ার বোসের স্ত্রী নীরদা—তারও স্বামী বিদেশে কাজ করে,—কখন কালেভদ্রে টাকা পাঠায়, সেই টাকার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে বাছার দুসন্ধ্যা আহার জুটিত না,—আর রূপ ত নয় যেন ফেটে প'ড়ছে;—ভাগ্যি রমেশ বাবুর সুনজরে পড়িয়াছিল, তাই কোন

অভাব তাই। আরও কিছু হাতে করিয়াছে;—সে দিন সোণার বালা ফরমাজ দিয়াছে!

মনোরমা বলিল, "পোড়া কপাল সোণার বালার! এক সন্ধ্যা খাইয়া না খাইয়াও যদি মরিতে হয়, তবুও অমন বালা পরিবার সাধ যেন কারও হয় না।"

ময়রা-দিদি দেখিল, তাই ত, এ যে কিছুতেই নড়ে না।

তখন ময়রাদিদি আবার গল্প আরম্ভ করিল, "দেখ, আমাদের জমিদার হরগোবিন্দ বাবুর কি দয়ার শরীর! আহা কাঙ্গাল গরিবের মা বাপ; কেহ কখন শুধু হাতে ফেরে না। এই সেদিন আমি গিয়াছিলাম, আমায় গরিব দেখিয়া অমনি এক টাকা দিলেন। তা বলি বৌ, তোর এত কষ্ট, তুই কেন একবার গিয়া দেখ্ না;—তোর কোন অভাব থাক্‌বে না। আর তিনি লিখিয়া পড়িয়া তোর সোয়মীকে আনিয়া দিবেন।"

মনোরমা উত্তর করিল, "আমি কেন জমিদারের বাড়ী যাইতে যাইব? তিনি দুদিন বিদেশে গিয়াছেন বৈত নয়; তা ব'লে কি আমি ঘরের বৌ হইয়া জমিদারের সাম্‌নে দাঁড়াইতে যাইব?"

ময়রাদিদি মনে মনে বলিল, "কি ঘরের বৌই হইয়াছে!" প্রকাশ্যে বলিল, "বলি তা নয়—তা নয়, তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না,—তুমি একবার জমিদারের সাম্‌নে দাঁড়াইলেই হইল। আমি তোমার হইয়া সব কথা বলিব।"

মনোরমা এতক্ষণ তাহার সরল বুদ্ধিতে ময়রা-দিদি দৌত্য-কার্য্যের অর্থ বুঝিতে পারে নাই। এবার বুঝিতে পারিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "ময়রা-দিদি, ভাল চাও ত এখনি এখান হইতে দূর হও;—আমি রূপ বিক্রয় করিতে বসি নাই।"

ময়রা-দিদি ফিরিয়া দেখিল, মনোরমার চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে। আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া পাপিষ্ঠা উঠিয়া গেল। পথে যাইবার সময় বকিতে বকিতে গেল, "বিষ নাই কুলোপানা চক্র! এ দর্প যদি না চূর্ণ করিতে পারি, তবে আমি জেতে ময়রা নই।"

সেই রাত্রে হরগোবিন্দের সঙ্গে ময়রা-দিদির কি একটা ফুস-ফাস হইয়াছিল, আমরা ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিষম ফাঁদ।

কিছু দিন পরে মনোরমা পত্র পাইলেন ;—

"প্রিয়তমে,

তুমি এখানে আসিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছ, আমিও অনেক দিন হইতে তোমায় এখানে আনিবার কল্পনা করিতেছিলাম। মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পরই তোমাকে এখানে আনিব মনে করিয়াছিলাম। অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া আনিতে পারি নাই। সম্প্রতি আমার মাহিনা বাড়িয়াছে ; এখন আর আনিবার কোন আপত্তি নাই ! আজ আমার চাকর, হৃদয় এখান হইতে রওয়ানা হইল, পরশু পৌঁছিবে। তাহার সঙ্গে যত শীঘ্র পার আসিবে। উৎকণ্ঠিতচিত্তে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বড় ব্যস্ত আছি, অধিক আর কি লিখিব।

তোমারই নগেন্দ্র।"

পত্র পাইয়া মনোরমা আহ্লাদে অধীর হইলেন। শেষ পত্রে তিনি অনেক কাঁদাকাটা করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার কথা লিখিয়াছিলেন সেইচিঠির এই উত্তর। তাত হইবারই কথা। নগেন্দ্র কি মনোরমাকে একেবারে ভুলিতে পারেন ?

এতদিন কেবল কার্য্যের গতিকে বৈতনয় তিনি চিঠি লিখিতে পারেন নাই। আর মাহিনা বাড়িয়াছে বড়ই আহ্লাদের কথা। হস্তাক্ষরটা তত মিলে নাই, তা তাড়াতাড়িতে অমন হইয়া থাকে। বিশেষ পুরাতন চাকর হৃদয় আসিতেছে, তাহার সঙ্গে যাইতে অবিশ্বাস কি? মনোরমা জিনিস পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

হৃদয়, নগেন্দ্রের পুরাতন ভৃত্য; নগেন্দ্রের সঙ্গে যায়। হৃদয় মনিবের পয়সা নানা প্রকারে চুরি করিত। নগেন্দ্র বারণ করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। শেষে তিনি হৃদয়কে পুলিসে দেন। অনেক লাঞ্ছনা ভোগের পর নগেন্দ্রের অনুগ্রহেই হৃদয় অব্যাহতি পায়। কিন্তু নগেন্দ্রের নিকট তাহার চাকুরী মিলে নাই। কিন্তু তাহাতেই হৃদয় নগেন্দ্রের উপর জাতক্রোধ। এবৃত্তান্ত কিন্তু মনোরমা কিছুই জানেন না। অদ্য ২।৩ দিন হইল, হৃদয় দেশে আসিয়াছে। নগেন্দ্রের সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প এই বিশ্বাস-ঘাতক ভৃত্য হৃদয়, কুটিনী ময়রা-দিদি এবং পাপিষ্ঠ জমীদার হরগোবিন্দের ষড়যন্ত্রেই নগেন্দ্রের স্বাক্ষরিত পত্র মনোরমার হস্তগত হয়।

সরলা গৃহলক্ষ্মী, পিশাচের ষড়যন্ত্র কি বুঝিবে? মনোরমা ভাবিল, আহা, আজ তাহার কি সুখের দিন! এতদিন পরে স্বামি-দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটিবে, পতিব্রতা সতীর ইহার বাড়া আর সুখ কি?

হৃদয়, নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যাকালে মনোরমার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। গৃহস্থালী যাবতীয় জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া, মনোরমা শুভ যাত্রার উদ্যোগ করিলেন? হৃদয়, পূর্ব্বেই পাল্কী বেহারা সংগ্রহ করিয়া করিয়া রাখিয়াছিল;—সতী স্বামীদর্শন-আশায় অতি-মাত্র প্রফুল্ল-চিত্তে, বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে, যানে আরোহণ করিলেন।

পাপিষ্ঠ জমিদার হরগোবিন্দের বাগান-বাটী, গ্রাম হইতে তিন চারি ক্রোশ দূর হইবে। রাত্রিকাল। বাহকগণ, আরোহি-সমেত পাল্কী উঠাইয়া, তাহাদের সেই ছিন্দি ভিন্দিময় "হুঁহুঁ" বেহারাবারি, স্বরে, চক্ষের নিমিষে, পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। হৃদয়, অতি কষ্টে দৌড়িয়াও অনেক সময় তাহাদের সঙ্গ লইতে পারিতেছে না।

পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ, এতক্ষণ যান যথাপথে আসিতেছিল; এই বার বিপথে চলিল। মনোরমার বুকের ভিতরও হঠাৎ কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। একি—ষ্টেসনের পথ ত এত দূর নয়! মনোরমা যে অনেকবার রেলপথে বাপের বাড়ী গিয়াছে; কিন্তু সে পথ ত এক মাইলের অধিক হইবে না!

পাল্কীর দ্বার খুলিয়া মনোরমা দেখিল যে, বাহকেরা তাঁহাকে এক নিবিড় জঙ্গলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। রাত্রিকালে, বনমাঝে, সতীর হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল।

এইবার একটা তে-মাথা ক্ষুদ্র পথে বাহকেরা পাল্কী নামাইল। পথ নিরূপণ হইতেছে না। পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, হৃদয় আসিয়া উপস্থিত হইল। হৃদয়কে দেখিয়া, তাহারা হরগোবিন্দের বাগান-

বাটীর পথ জিজ্ঞাসা করিল। পাপিষ্ঠ সেইরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"এই যে ডান-হাতির এই পথ; আর বড় জোর ক্রোশটাক্ আছে।"

এইবার মনোরমার আশঙ্কা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। বুঝিতে বাকী রহিল না যে অনতিবিলম্বে পিশাচের হাতে পড়িতে হইবে। তবুও, কি জানি কেন, শেষ আশায় বুক বাঁধিয়া, তিনি ভগ্নস্বরে, কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, —"হৃদয়! কি এ শুনিতেছি? স্বামীর কাছে লইয়া যাইবে না?"

বিকট হাস্যে পিশাচ উত্তর দিল,—"সুন্দরী! আজ তোমাকে এক নূতন স্বামীর হাতে সমর্পিব।"

মনোরমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সতী চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু সেই অন্ধকারে, ততোধিক ভয়াকুল অন্তরে, ভক্তিভরে, পতিব্রতা ভগবান্‌কে ডাকিলেন। ভগবানের চরণে অভাগিনীর সে মর্ম্ম-কাতরতা স্থান পাইল।

পাপিষ্ঠ হৃদয় এবার সকল কথা খুলিয়া বলিল, কহিল,—"তোমার স্বামী আমার বুকে যে দাগা দিয়াছে,আজ প্রাণ ভরিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব! এখন চল সুন্দরী!"

এই বলিয়া পিশাচ, বস্ত্রদ্বারা সেই ভীতা, লজ্জাবতী-লতার মুখ-হাত-পা—সব বাঁধিয়া ফেলিল। বাঁধিল, পাছে অভাগিনীর করুণক্রন্দনে, এই নির্জ্জন অরণ্যেও কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাহকেরা, নব্যোদ্যমে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়,—হরি হরি! কোথা হইতে কয়েকজন বিকটাকার

দস্যু আসিয়া অগ্রেই হৃদয়কে আক্রমণ করিল এবং বিষম লগুড়াঘাতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণে মারিল। অবশেষে পাল্কীর উপর "দুম দুম" রবে লগুড়াঘাত করায়, বাহকেরা পাল্কী ফেলিয়া প্রাণভয়ে কে কোথায় পলাইল। দস্যুদল পাল্কী ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরস্থ আরোহীকেও আঘাত করিল! পরিশেষে দেখিল, আরোহী পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ং দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তাহাকে প্রাণে মারা নিরর্থক বুঝিয়া, তাহাকে সেই বন্ধন-দশায় ফেলিয়া রাখিয়া, দস্যুদল যাবতীয় জিনিস পত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল।

আর যাইবার সময় হৃদয়ের শবদেহ নিকটস্থ বিলে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে, সেই পথ দিয়া দু একজন পথিক যাইতেছিল। একজন এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া গ্রামে সংবাদ দিল। গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। কেহ রঙ্গ দেখিতে, কেহ কৌতুহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে, আর কেহ বা 'আহা' বলিতে সেই স্থানে পঁহুছিল। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিল; অনেক লোক চলিয়া গেল; কিন্তু মুমূর্ষুর প্রতিকার কেহ কিছু করিল না।

বেলা এক প্রহর হইতে যায়;—হরিহর রায় নামক গ্রামের একজন প্রবীণ বৃদ্ধলোক তথায় উপস্থিত হইয়া, অবিলম্বে মুমূর্ষুর চেতনা সম্পাদন করাইলেন; এবং ভয় বা পরিণাম—কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষায় যত্নপর হইলেন। হরিহর দেখিলেন যে, মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটি এখনও বাঁচিলে বাঁচিতে পারে।

তার পর দয়ালু হরিহর, বহু যত্নে তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন।

ডাকাইতদের বিষম আঘাতে মনোরমার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছিল। হরিহর ও তাহার পত্নীর অনবরত শুশ্রূষায় মনোরমা কিছু সুস্থ হইলেন। সেই শুশ্রূষা করিতে হরিহর ও তাহার পত্নী আপনাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়া গেলেন। সেই অসহায়া অনাথা বালিকার শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে কি একটা হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু গাঁয়ের একটা মাগী দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিল, "আঃ, সেবার রকম দেখ, ঘরে যেন গুরু-ঠাকরুণ এসেছেন!" সেই কথা মনোরমার কাণে গেল। তার পর আবার গরম জল লইয়া হরিহরের পত্নী সেক দিতে আসিলে মনোরমা সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "থাক আর দিতে হবে না, আপনিই সেরে যাবে।" হরিহরের পত্নী দু-হাত দিয়া মনোরমাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল, "এমন দিন ত রোজ হয় না।" অনবরত শুশ্রূষায় অল্পদিনেই মনোরমা সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন।

সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু মনোরমার ঘরে ফিরিয়া যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। একেত ডাকাতে যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়াছে, তার পর আবার সেই জমিদারের জমিদারিতে মনোরমা কাহার আশ্রয়ে যাইবে; এ দিকে হরিহর নিঃসন্তান ছিলেন। মনোরমাকে কন্যার মতন যত্ন করিতে লাগিলেন। যাইবার কথা উঠিলেই হরিহর ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েরই চক্ষু ছল ছল করিত।

কিন্তু মনোরমাকে লইয়া হরিহর একটু দায়ে পড়িয়াছিলেন। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোক—যাহাদের ভাত হজম হইত না, তাহারা মনোরমার কথা লইয়া অনেক সময় কাটাইত। কথাটাও নানা-রকম আকার ধারণ করিয়াছিল। মনোরমা সুন্দরী ছিলেন,

সেই জন্য কাহার কাহার চক্ষুও তাহার উপর পড়িয়াছিল। ক্রমে কথাটা এত বাড়িয়া গেল যে, গ্রামের চৌকিদার যে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, সেও পুলিসে খবর না দিয়া থাকিতে পারিল না। পুলিস কি একটা গোলযোগ বাঁধাইবে মনে করিতেছিল, আর হরিহরও একটু ভয় পাইতেছিলেন, তবে নাকি জমিদারের নাম ঘটনাটির সঙ্গে যোগ ছিল, তাই তদন্ত করিবার আগে পুলিস একবার জমিদারের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সেখানে যৎকিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা দক্ষিণা পাইয়া পুলিস কি ঠিক করিয়াছিল বলিতে পারি না, তবে কোন তদন্ত হয় নাই। হরিহর অগত্যা সে দায় হইতে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে চৌকিদার মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে বলিয়া তাহার চাকরি গেল।

হরিহর পুলিসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু জমীদার হরগোবিন্দ রায়ের বিষ-নয়নে পড়িলেন।

হরিহর ও তাঁহার পত্নী নিঃসন্তান বলিয়া অনেক দিন হইতে তীর্থ দর্শনে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন। আজ জমীদারের জ্বালায় তাঁহাদের গ্রাম ছাড়িয়া তীর্থ দর্শনে যাওয়া স্থির হইল। মনোরমা ভাবিতেছিলেন, আমি যেখানে যাই, সেখানেই আমার ভাগ্যদোষ সকল সুখ ফুরাইয়া যায়। মনোরমা নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছেন। তাই হরিহরের স্ত্রী যখন মনোরমাকে লইয়া তীর্থ দর্শনে যাইবেন বলিলেন, মনোরমা "সঙ্গে যাইব না" বলিয়া বসিল। হরিহরের স্ত্রী কিন্তু "না" উত্তর শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তবে তুমি থাক, আমরা কিন্তু তোমার স্বামী যেখানে আছেন সেই

থান দিয়া যাইব।" মনোরমার সাধ্য কি যে, আবার "না" বলে।

শুভদিন দেখিয়া হরিহর, তাঁহার পত্নী ও মনোরমা তীর্থ-দর্শনে বাহির হইলেন।



নবম পরিচ্ছেদ।

স্বামী-সন্দর্শন।

নগেন্দ্র সেই এক দিনের ভুল সংশোধন করিতে পারেন নাই, অধঃপতনের পথে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দু-দিন আগে যাঁহারা নগেন্দ্রের সরল স্বভাবের গুণে মুগ্ধ হইয়া পথে দেখা হইলে দুটা কথা না কহিয়া যাইতেন না, আজ তাঁহারা নগেন্দ্রকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান।

নগেন্দ্র ভাবিতেন, ইহাতে তাঁহার কি আসিয়া যায়? তিনি যদি না খাইতে পাইয়া মরিয়া যান, তবে কি কেহ তাঁহাকে আনিয়া আহার যোগাইবে? আর পৃথিবী কয়টা দিনের জন্য? তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝেন, নিজে যাহাতে সুখী হন, তাহাই করিবেন। পরে কি বলে, তাঁহার অত দেখিবার আবশ্যক নাই।

অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রের মনে এই ধারণা এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, যদি কেহ তাঁহাকে বুঝাইতে আসিত, অনেক সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতেন না। আর যদি নিতান্ত চক্ষু লজ্জার খাতিরে, নিতান্ত নির্ব্বন্ধে দেখা করিতেন, তবুও তাহারা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে কুকুর ডাক বিড়াল ডাক ডাকিয়া বিদায় দিতেন। যাঁহারা নগেন্দ্রের উন্নতিতে খুসি

হইতেন, তাঁহারা একে একে নগেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু নগেন্দ্রের ধারণা যাহাই হউক আর তিনি যাহাই করুন, তাঁহার শরীরে অত সহিল না। সেই অমিতাচারের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই বিষম রোগ নগেন্দ্রকে ঘেরিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শয্যাশায়ী হইলেন।

সেই বিদেশে, একাকী বন্ধুহীন রুগ্ন-শয্যায় পড়িয়া নগেন্দ্রের ক্রমে ক্রমে চৈতন্য হইতে লাগিল। রোগের যাতনার সময় যখন তাঁহার মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, মনোরমার অকৃত্রিম ভালবাসা মনে পড়িত, তখন দুটি চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। আর তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার স্মরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইত যে, সেই দণ্ডেই আত্মহত্যা করেন।

একদিন প্রবল জ্বরের প্রকোপে নগেন্দ্র অজ্ঞান হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলেন, এমন সময় একটী প্রৌঢ় ব্যক্তি আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পাছে তাঁহার পদ শব্দে রোগীর কোন অসুখ বোধ হয়, সেই জন্য তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া রোগীর শিয়রে বসিলেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, উত্তাপ খুব বেশী ও রোগী তখনও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতেছে। কাছে মুখে জল দিবার কেহ নাই। রোগী প্রলাপ বকিতেছে বটে, কিন্তু যখনই সেই প্রলাপের সঙ্গে মনোরমা অথবা মাতার কথা বলিতেছিল, তখনই অনুতাপের দংশনযুক্ত অসীম যাতনাময় কতকগুলি কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। সেই অসহায় অবস্থা দেখিয়া, সেই প্রলাপ শুনিয়া আগন্তুক চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারেন নাই। কতক্ষণ

পরে নগেন্দ্রের জ্ঞান হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শিয়রে বসিয়া কে বাতাস করিতেছে। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ বাবা ?"

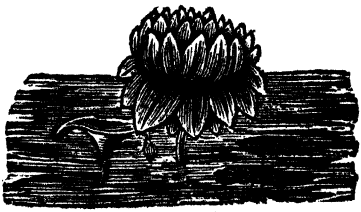
আজ বিদেশে বন্ধুহীন রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া, কে এমন স্নেহের স্বরে নগেন্দ্রকে ডাকিল ?

নগেন্দ্র চক্ষু চাহিলেন, চিনিতে পারিলেন না। আগন্তুক তখন বলিলেন, "আমার নাম হরিহর রায়।" পরে গোপন করিয়া কহিলেন, "তোমার পিতার সঙ্গে আমার জানা-শুনা ছিল। কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিতে হইয়াছে। তোমার ব্যাম শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া আগন্তুক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ ?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বেশী দেরি নাই, সব ফুরাইয়া আসিতেছে।" নগেন্দ্র গায়ের লেপ তুলিয়া দেখাইলেন। হরিহর যাহা দেখিলেন, তাহাতে শিহরিলেন। অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট নর-কঙ্কাল মাত্র, বুকের নিকট ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

সেই হরিহর, যিনি একদিন সকলের কথায় উপেক্ষা করিয়া, মুমূর্ষু মনোরমাকে লইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন, আজ বিদেশে সেই মনোরমার স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় না গলিবে কেন ? তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, নগেন্দ্রকে সব কথা বলিয়া তবে মনোরমাকে আনিবেন এবং সেই জন্য তাহাকে এক ভদ্রলোকের ঘরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু যে অবস্থা দেখিলেন, সে সব কথা বলিবার আর সময় কোথায় ? অল্পক্ষণ পরেই হরিহরের আদেশে মনোরমা ও তাঁহার পত্নী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল! মনোরমা নগেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল

হইল। মনোরমার উপর পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া আর তখনও তাঁহার উপর মনোরমার অবচলিত প্রেম-স্নেহ-ভক্তি দেখিয়া নগেন্দ্রও কত কাঁদিলেন। সেই রুগ্ন শয্যায় শুইয়া কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জন্মান্তরে তাঁহার মত স্ত্রী পাইবার জন্ত কত কামনা করিলেন। আপনাকে কত তিরস্কার করিলেন। এদিকে হরিহরের উদ্যোগে ও চেষ্টা-যত্নে নগেন্দ্রের রীতিমত চিকিৎসার গুণে, ততোধিক সেবা ও শুশ্রূষার গুণে নগেন্দ্র এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।



দশম পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

জমিদার হরগোবিন্দ বাবু, তাঁহার লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছিলে।

অপরিমিত ব্যয়ে, অনাচারে ও অত্যাচারে তাঁহার গৃহ ক্রমে অর্থশূন্য হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খরচ বাড়া বই কমে নাই। সময়ে খাজনা দিতে না পারাতে ক্রমে তাঁহার জমিদারী লাটে চড়িল। পশ্চিম অঞ্চলের কোথাকার এক বাবু তাঁহার জমিদারী কিনিয়াছেন। হরগোবিন্দ বাবু তবুও দখল দিবেন না সাব্যস্ত করিলেন। অনেক প্রজাকে জোট করাইয়া নূতন জমিদারের খাজনা বন্ধ করাইলেন। তাঁহার নায়েব গোমস্তা আসিলে মার খাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নূতন জমিদার ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি আবার নূতন পাকা নায়েব গোমস্তা পাঠাইলেন। দুই দলে বড়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গেল। হরগোবিন্দ বাবু তখন ফৌজদারি সোপরন্দ হইলেন। অনেক মোকদ্দমা হইল। কিন্তু শেষে ধর্ম্মের জয় হইল। হরগোবিন্দ বাবু জেলে যাইলেন।

নূতন জমিদার কিন্তু বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রজা বশীভূত করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামে আসিবার পূর্ব্বেই গ্রামে সদাব্রত, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। নায়েব ও গোমস্তার উপর কড়া হুকুম ছিল। তাহারা যাহাতে প্রজার উপর কোন রকম অত্যাচার করিতে না পারে, জমিদার নিজে তাহা দেখিতেন। গরিব দুঃখীরা দুঃখের সময় খাজনা মাপ পাইত। জমিদারের কন্যার বিবাহে চাঁদা, জমিদারের পুষ্করিণী কাটাইবার ব্যয়, নায়েবের মাতৃশ্রাদ্ধে চাঁদা উঠিয়া গেল। অল্প-দিনের মধ্যেই প্রজারা দেখিল, এত সুখে তাহারা কখন থাকে নাই। শতমুখে নূতন জমিদারের প্রশংসা তাহারা গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারিতে নূতন প্রজার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে জমিদারের জন্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। তেমন অট্টালিকা চারি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে কোথাও ছিল না। সেই অট্টালিকা দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে কত লোকই আসিত। সম্মুখে মন্দির ও পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠিত হইল। পার্শ্বে মনোরম উদ্যান ও অনতিদূরে কাছাড়ী-বাড়ী। যিনি এত টাকা ব্যয় করিয়া এমন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারেন, না জানি, তাঁহার কতই আয় হইবে। প্রজারা আপনাদের মধ্যে কতই বলাবলি করিত।

আজ সেই সুন্দর অট্টালিকার তোরণ দ্বারে মধুর নহবৎ বাজিতেছে। তোরণ দ্বারের সম্মুখে পূর্ণকুম্ভ নব-পল্লবিত আম্র-শাখা ও কদলী বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। মুরারি সিং দরওয়ান নববস্ত্রে বিভূষিত হইয়া তকমা ও নূতন সালুর পাগড়ী লইয়া বড়

বিপদে পড়িয়াছিল। তকমা ১৫।১৬ বার মাজিয়াও তাহার বোধ হইতেছে যে, আরও মাজিলে বুঝি আরও একটু উজ্জল হইবে। আর পাগড়ী ১৮ বার ১৮ রকম ধরণে মাথায় বসাইয়াও তাহার মনঃপূত হয় নাই। দাস-দাসী সব নূতন বস্ত্র ও রূপার থালা লইয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে যাওয়া আসা করিতেছে। দেশ বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল; আর ভিক্ষুক কাঙ্গালি এত জমিয়া ছিল যে, ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করে কাহার সাধ্য? আজ নূতন জমিদার তাঁহার নূতন জমিদারিতে ও নূতন গৃহে প্রবেশ করিবেন।

নায়েব গোমস্তা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যে, কতক্ষণে জমিদার আসেন। অল্পক্ষণ পরেই পাইক আসিয়া সংবাদ দিল যে, জমিদার গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন। ক্রমে প্রজাগণের আনন্দ-কোলাহল বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদার আসিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মধুর নহবৎ মধুরতর স্বরে বাজিয়া উঠিল।

তার পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালি বিদায়ের ধুম পড়িয়া গেল। এত দান কেহ করিতে দেখে নাই। জমিদার বাবু ধনের সার্থক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। শতমুখে তাঁহার প্রশংসা-ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

দ্বিতল কক্ষের জানালার অন্তরাল হইতে জমিদার বাবুর পত্নী কাঙ্গালীবিদায় দেখিতেছিলেন, সেই কাঙ্গালিগণের ভিড়ের মধ্যে একটী বৃদ্ধা ভিখারিণীর বড়ই লাঞ্ছনা হইতেছিল। সেই ভিড়ের স্রোতে পড়িয়া বৃদ্ধাও তাহার বিদায় লইতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ ছিল, যাহার দিক দিয়া যাইতে-

ছিল, সেই তাহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিতেছিল। অনেক কষ্টে বৃদ্ধা অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু শেষে একটী প্রবল ধাক্কায় বৃদ্ধাকে ভূপতিত করিল, বৃদ্ধা পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

জমিদারের পত্নী তাঁহার দাসীকে ডাকিলেন। বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ ভিখারিণীকে লইয়া আয়।"

দাসী বলিল,—"সেকি মা, ওর যে সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ, উহাকে কেমন করিয়া ঘরে আনিব? পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাতক করিয়াছিল, তাই এ জন্মে ফলভোগ করিতেছে, উহাকে স্পর্শ করিলেও পাপ আছে।"

জমিদার পত্নী বলিলেন,—"তোর অত কথায় কাজ নাই, যা বলিতেছি শোন্;—উহাকে লইয়া আয়।"

দাসী বকিতে বকিতে চলিয়া গেল, "মার ঐ কেমন এক রকম! কোথায় কার একটু বেশী দুর্দ্দশা দেখিয়াছেন, অমনি আপনার হাতে দান না করিলে হইবে না।"

তখন বৃদ্ধা ধীরে ধীরে দাসীর সঙ্গে জমিদারের গৃহে প্রবেশ করিল। ফটকে ঢুকিবার সময় মুরারিসিং তাহাকে দেখিয়া, তাহার পাকা বাঁশের লাঠী দিয়া একবার ঠেলিয়া দিতে গিয়াছিল, তা যখন দেখিল মার হুকুম, তখন আর কিছু বলিলনা।

বুড়ীকে, দাসী অন্তঃপুরে লইয়া গেলে, মনোরমা নীচে আসিলেন, সেই সময়ে জমিদার বাবু কি একটা কার্য্যের জন্য উপরে যাইতেছিলেন। সেই কুষ্ঠরোগীকে ঘরের মধ্যে দেখিয়া, তিনিও ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীকে তাহার নিকট দেখিলেন, তখন বুঝিলেন, এ তাঁহারই কাজ।

জমিদার বলিলেন, "মনোরমা! এ তোমার কি কাণ্ড?

আজকের দিনে এই কুষ্ঠরোগীকে কি ঘরে না আনিলে হইত না?"

মনোরমা বলিলেন,—"আর কিছুর জন্ম আনি নাই, কেবল এ লোকটী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত; ইহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, ইহাকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিবার জন্ম আনিয়াছি।"

নগেন্দ্র মুখ ফিরাইলেন,—এই কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয়? অনেক দেখিয়াও নগেন্দ্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

তখন মনোরমা বলিলেন,—"প্রাণধিক! একদিন বিধাতার কার্য্যে দোষ দিয়া বলিয়াছিলে, পৃথিবীতে পাপের শাস্তি নাই; একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি, ময়রা-দিদিকে চিনিতে পার কি না?"

ময়রা দিদির সেই শাস্তি দেখিয়া, নগেন্দ্র শিহরিলেন। মনোরমা তাহার পর আর বেশীক্ষণ তাহাকে ঘরে রাখেন নাই, এক জোড়া কাপড় ও একটা টাকা দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। শুনিয়াছি তাহার পর মনোরমা ময়রাদিদির জন্ম কিছু মাসিকবৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ময়রাদিদিও সেই ঘৃণিতরোগযুক্ত দেহ লইয়া অনেক দিন বৃত্তিভোগ করিল। হরিহর চোখে চসমা আঁটিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া নগেন্দ্রের বৈঠকখানায় তামাক খাইতেছিলেন আর মাঝে মাঝে চাকরদের এটা—ওটা ফরমাজ করিতেছিলেন।

হরিহর সর্ব্বদাই ব্যস্ত। নগেন্দ্রের জমিদারির সকল প্রজাই তাঁহার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও রোগে শোকে বিপদে হরিহর কখনও অনুপস্থিত থাকেন নাই। কাল সনা-

তনের স্ত্রী ওলাউঠায় মারা পড়িয়াছে, আজ সনাতনেরও ওলা-উঠা দেখা দিল।—গ্রামের লোক ভয়ে নিকটে যায়না, কিন্তু কোথা হইতে হরিহর আসিয়া উপস্থিত। রামের মা ধান ভানিয়া খায়, কাল ঢেঁকিতে তাহার হাত পিসিয়া গিয়াছে, তাহার বাড়ীতে রাঁধিবার কেহ নাই, রামের মা উপবাসী রহিয়াছে ;—হরিহর শুনিতে পাইয়াই আসিয়া তাহার আহারের যোগাড় করিয়া দিলেন। হরিশের বাড়ীশুদ্ধ সকলের ব্যায়রাম হইয়াছে, মুখে জল দিবার কেহ নাই, হরিহর কয় রাত্রি তাহাদের বাড়ী জাগিয়া কাটাইলেন। হরিহরের বিশ্বজনীন প্রেম গ্রামশুদ্ধ লোককে মুগ্ধ করিয়াছিল। আর পরের কার্য্য করিতে করিতে দিনরাত্রের মধ্যে তাঁহার অবসর ঘটিয়া উঠিত না। কেবল মাত্র আহারের পর দুই ঘণ্টা আন্দাজ নগেন্দ্রের বৈঠকখানায় বসিতেন। তা সেই দুই ঘণ্টা কাল যে হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতেন তাহা নয়, অনেক রকম লোক তাঁহার কাছে অনেক দুঃখের কথা কহিতে আসিত।

আজ তেমনি করিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় রমানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। রমানাথ গাঁয়ের একজন মোড়ল ও কিছু সংস্থান করিয়াছিল। হরিহর আসিতেই তাহার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছিল। ও অনেক কথা—যাহা অপরে হরিহরকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না, রমা-নাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত।

তাই আজ রমানাথ হরিহরকে বলিল,—"হ্যা দেখ দাদা-মশায়, অনেক দিন হইতে বলিব বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু সাহস হয় না, কিন্তু না বলিলেও নয়। তা বলিব কি ?"

হরিহর বলিলেন "বল না কেন? কেহত নিষেধ করে নাই।
রমানাথ বলিল, "কি জান, বড় মানুষের কথা। তা হোক শুনিতেছি আমাদের গ্রামে পূর্ব্বে নগেন্দ্র ছিলেন তিনিই নাকি আমাদের জমিদার হইয়াছেন। সেদিন একথা লইয়া বড় তর্ক হইয়াছিল। আমি সেদিন এত বুঝাইলাম যে, নগেন্দ্র মাতাল হইয়া কোথায় বিবাগী হইয়া গিয়াছে, আর তাহার স্ত্রী ডাকাতের হাতে মারা পড়িয়াছে। তবু আমার কথা সকলে বিশ্বাস করিল না। তা ইহার মূল কথাটা কি বলিতে পার।

হরিহর যেমন যেমন জানিতেন বলিলেন। শুনিয়া রমানাথ বলিল, "তবেত আমাদের হ'রে ঠিক চিনিয়াছিল। তা মরুক যাক, এত টাকা আসিল কিরূপে? নগেন্দ্র বাবু নাকি যকের ধন পাইয়াছেন?"

হরিহর বলিলেন, "না নগেন্দ্রের এক জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি মরিবার সময় নিঃসন্তান মরেন। তাঁহার অতুল বিষয় ছিল, নগেন্দ্র সেই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন।"

এই সমস্ত কথা হইতেছে, এমন সময় একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালক, হাত ধরিয়া জোর করিয়া হরিহরকে "দাদামহাশয় আসুন, বাবা ডাকিতেছেন" বলিয়া টানিয়া লইয়া গেল। রমানাথের বুঝি আরও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, সে যাত্রা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

হরিহর গিয়া দেখেন যে, নগেন্দ্র প্রস্তুত হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হরিহরকে দেখিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "চলুন, আজ আমাদের অতিথিশালা প্রতিষ্ঠার দিন। আসুন দেখি, সব কেমন হইয়াছে।"

হরিহরের এ সব কার্য্যে বড় উৎসাহ। বিনা বাক্যব্যয়ে চলিলেন। যাইয়া দেখেন যে, নূতন অতিথিশালা তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠা হইল।

সম্পূর্ণ।